সংকটে উত্তরের বন্যপ্রাণ: আমরা কি শঙ্কিত?

হাজার প্রতিকূলতা তবু হাল ছাড়তে নারাজ
মুখোমুখি বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ

বনরক্ষায় চাই ফৌজি কায়দায় অপারেশন
নাকি কোনও সামাজিক বিপ্লবের অপেক্ষা?

শরতের আকাশে চা বাগানে কালো মেঘ!

ডুয়ার্সের পুজো তখন ও এখন

এখন ডুয়ার্স

১ অক্টোবর ২০১৬। ১২ টাকা

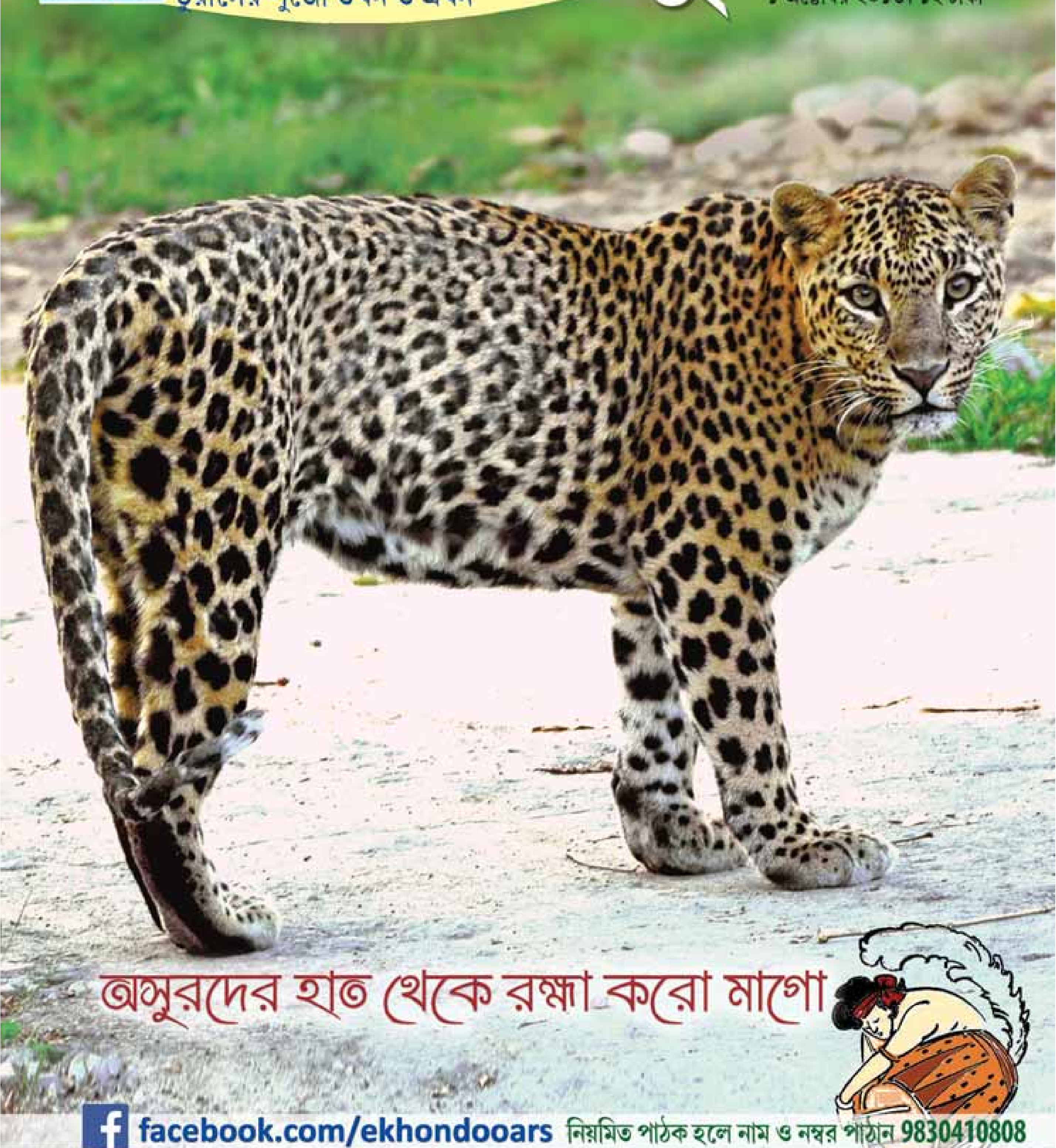

সবুজ সবুজ লাগছে তবু সবুজ তেমন নেই
ঝোপ-আগাছায় চোখ ঢেকে যায় বনের ভেতর যেই
পা রেখেছি বন বলেছে - নেহাত ছদ্মবেশ
পরতে পরতে বন্যজীবন হচ্ছে রোজই শেষ!

বনের ভেতর রেললাইনে অনেক গেল প্রাণ
ফ্ল্যাসের ঝলক লেন্স-বিহারে ভালবাসার ভান
বন্যপ্রাণের নিখুঁত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায়
কিন্তু তারা বিপন্ন আজ কে নেবে তার দায়?

রিসর্ট গড়ে বন ভরালাম, ফুর্তি আড়ম্বর
নির্মমতায় ধ্বংস করি বন্যপ্রাণের ঘর
জমজমাটি আসর বসাই মাইক খাবার মদ
আইন আছে মুখ লুকিয়ে বনের ভেতর বদ
দুষ্কৃতিরা গাছ কেটে নেয়, করছি সেমিনার
বাঘ-হাতি-মোষ-পাখপাখালি সবারই বুকভার!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- তাপস দাস, আইএফএস

এবারের ‘এখন ডুয়ার্স’ বিশেষ উৎসব সংখ্যা হওয়ায় নিয়মিত বিভাগ ও ধারাবাহিকগুলি প্রকাশিত হল না। পুজোর ছুটি থাকায় পরবর্তী ১ নভেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হবে দীপাবলীর আগেই। সেই সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ও নিয়মিত বিভাগগুলি ফের চালু হবে। পাঠকের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। উৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রকাশক, এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
১ অক্টোবর ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স

আমরাই পারি এরাজ্যের পর্যটনের হাল পাল্টাতে ৪

পূজা স্পেশাল

কলম সিং এবং পুজো পর্যটক ৬

সংকটে উত্তরের বন্যপ্রাণ ৮

হাজার প্রতিকূলতা তবু হাল ছাড়তে রাজি নই ১১

সমস্যার সমাধানে বন্য প্রাণ বিভাগ আশাবাদী ১৬

বনরক্ষায় প্রয়োজন ফৌজি কায়দায় অপারেশন ১৮

বড় কোনও সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ১৯

পর্যটনের ডুয়ার্স

গালভরা নাম ‘টি টুরিজম’ কিন্তু অন্য টুরিজমের সাথে তফাৎ কোথায়? ২০

অনবদ্য এক রেল মিউজিয়াম এখনও পর্যটনপ্রেমীদের অজানা ২৩

হোম যেখানে ওয়াইল্ড বক্সা বাঘবনে নতুন ঠিকানা ২৫

ডুয়ার্সের চা বলয়ে আগমনীর পরিবর্তে কন্যা বিসর্জনের কান্না ২৬

উৎসবের প্রাক্কালে চা-বাগানে কালো মেঘ! ২৯

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার ৩৪

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৬

দেবীপক্ষে শুরু উল্কাদান দিয়ে শেষ ৩৮

ডুয়ার্সের সেরা পুজোর আগাম হদিশ

জলপাইগুড়ির পুজো ৪০

আলিপুরদুয়ারের পুজো ৪২

কোচবিহারের পুজোয় ৪৭

মথুরা বাগানের পুজো আজও একইরকম জমজমাট ৪৪

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/aaddaghar

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

আসছে দুর্গাপুজো। দোকানে দোকানে উপচে পড়ছে নতুন পোশাক কেনার ভিড়। জলপাইগুড়িও সেজে উঠেছে নতুন সাজে। করলা নদীর দু'ধার বাঁধিয়ে দিয়ে সৌন্দর্যায়নের কাজ ইতিমধ্যেই এগিয়ে গিয়েছে অনেকটাই। নদীর স্বস্তি। সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি চলছে স্পোর্টস ভিলেজের কাজ। করলা নদীর তীরে আন্তর্জাতিক মানের স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, যা জলপাইগুড়িকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে বলে আশা করা যায়। শহরের মধ্যেও নদীর সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হবে শিগগিরিই। মার্চেন্ট রোডে আর হসপিটালের রাস্তায় দু'ধারে ফুটপাত হওয়ায় পথ চলতি মানুষজনসহ দোকানদারেরাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, অন্তত দু'চাকাগুলো রেখে একটু বাজার করে নেবার তো একটা গতি হল। করলা নদী নিয়ে শহরের মানুষের একটা আলাদা আবেগ কাজ করে। দুর্গা ঠাকুর এবং তার সন্তানদের বিসর্জনের সময় খুলে নেওয়া হবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, মুকুট, গয়না ইত্যাদি, কারণ ওসব বইবার ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে করলা। মিউনিসিপ্যালিটি সে কথা বোঝে। তাই অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পদার্থেরও যাতে একটা হিল্লে করা যায়, তাই ১ কোটি টাকা খরচ করে দুটি কম্প্যাক্টর আনানো হয়েছে। শহরের সমস্ত নোংরা যাতে কমিয়ে আনা যায়, তাতে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ারও যেমন সুবিধে তেমনই একবারে অনেক বেশি বর্জ্য সাফও করে দেওয়া যাবে। পুজোয় থাকছে আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা, বাছাই করা আটটি পুজো কমিটি পাবে এই পুরস্কার। প্রথম পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং অষ্টম পুরস্কার ৫ হাজার।

মা-মাটি-মানুষের সরকার, নগর উন্নয়ন দপ্তর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সকলের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি সুষ্ঠভাবে তাদের কাজ করে চলেছে। পৌরসভার তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

আমরাই পারি এরাজ্যের পর্যটনের হাল পাল্টাতে

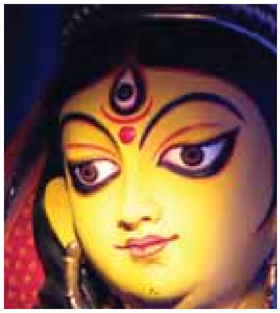

লোকে বলে বাঙালি নাকি তার নিজের শেকড় খোয়াতে বসেছে। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মতোই বাংলা ভাষাও আজ দীর্ঘ অব্যবহারে বিলুপ্তির পথে। আর তা বাঙালির নিজের সৌজন্যেই। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে দেশবিদেশ ঘুরে আমাদের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি কিন্তু অন্যরকম। যতই চটুল পাশ্চাত্য ও হিন্দি সংস্কৃতির উপর মোহ জন্মাক, নতুন প্রজন্ম যতই বাংলা লিখতে পড়তে না পারার ন্যাকামি করুক, বা স্বজাতির মহাজ্ঞানী-মহাজনের পরামর্শ যতই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, বাঙালি চরিত্র আদপে এতটুকু বদলায়নি বা ভবিষ্যতেও সে সম্ভাবনা নেই। সেই বাঙালি আলাস্কা বা আসানসোল যেখানেই থাকুক বা বাঙালিস্তানে না এসে থাকুক, ফল সেই একই। তাই আজও বাংলা খবরের কাগজ, বাংলা সিনেমা-সিরিয়াল বা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা একই রকম অক্ষুণ্ণ।

বাঙালি তার নিজের প্রদেশকেই ভাল করে জানে না। সাগর থেকে হিমালয় এই দুইয়ের মাঝখানে যে বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ড বিরাজমান তার সাম্প্রতিক সম্যক পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যে নেই। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন আটকে আছে নির্দিষ্ট গণ্ডীতে। অথচ একুশটা জেলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে যে সব মণিমানিক্য, তার খবর আমাদের কাছে প্রায় অজানাই বলা চলে। যাঁরা রাজ্যের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, যাঁরা সত্যিই চান পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পের বিকাশ তাঁদের পক্ষে ভবিষ্যতের মাস্টার প্ল্যান নির্মাণ রাজ্যটিকে ভাল করে না জানলে কখনই সম্ভব নয়।

সেই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে পর্যটন শিল্পের অগ্রগতি মানে আরও বেশি বেশি ভিন্‌দেশি পর্যটকের আনাগোনা— এই সাবেকি ধারণার মধ্যে আটকে থাকারও কোনও মানে আছে কি? আজকের বিশ্বায়নের যুগে ভিন্‌দেশি পর্যটক মানেই প্রচুর অর্থের সংস্থান এরকম ভাবার কোনও ভিত্তিই নেই। মুষ্টিমেয় উচ্চব্যয় ক্ষমতা সম্পন্ন ভিন্‌দেশি পর্যটক দিল্লি-রাজস্থানের হেরিটেজ বা নিদেনপক্ষে কেরলের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার আকর্ষণে আসে তার মধ্যে ক'জন সুন্দরবনে বা দার্জিলিং-এ আসবে বলে অনুমান? মালদহ বা মুর্শিদাবাদ তো ছেড়েই দিন। অতএব দশজন ভিন্‌দেশি পর্যটকের চাইতে এক হাজার নিজ রাজ্যের পর্যটকের সমাগম ঘটানো কি সহজতর নয়? তাতে উপার্জনও বেশি বই কম নয়। বাঙালির বেড়ানো যদি গোয়া-কাশ্মীর-উত্তরাখণ্ডের পর্যটনকে চাঙ্গা করে রাখতে পারে তবে তা একাই পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের হাল আমূল বদলে দিতে পারে নিঃসন্দেহে। আর বলাই বাহুল্য, তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজ্যের পর্যটনের সামগ্রিক চিত্রটি আরও বিস্তারিতভাবে এরাজ্যের পর্যটনপ্রেমী বাসিন্দাদের সামনে তুলে ধরা।

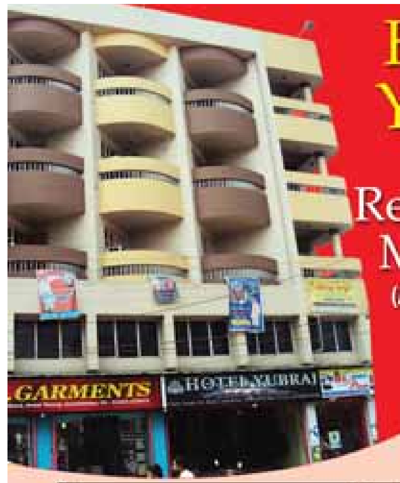

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch

(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

১২ বছরের বিশ্বস্ত নাম

Arajit Lahiri (Raja)

Chairman's Club Member for Agent

Contact for Free Consultancy & Servicing

- LICI Agent
- Housing Finance Ltd. Agent
- Mortgage Loan
- Premium Deposit
- NEFT Registration
- Nominee Changes
- All Type of Loan

সারা বছর আপনাদের সঙ্গে

9932103350, 9832452859
arajit45@gmail.com

আলিপুরদুয়ারের সার্বিক উন্নয়নে আমরা সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ডুয়ার্সের অন্যতম জেলা আলিপুরদুয়ারের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পর্যটকদের ভিড় প্রায় বছরভর তো আছেই। তা সত্ত্বেও বহু বছর অবধি অনুন্নয়ন ও অবহেলার সাক্ষী ছিল এখানকার পুর এলাকার মানুষ। ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয় উন্নয়নের কাজকর্ম। বলাইবাহুল্য এই সামান্য কিছু বছরেই পুরসভার কর্মকাণ্ডের তালিকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার চেয়ারম্যান শ্রী আশীষ চন্দ্র দত্ত জেলার পুরবাসীদের তরফে জানিয়েছেন, 'বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তালিকা যার মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প প্রায় শেষের পথে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— চিত্তরঞ্জন পল্লিতে রাস্তা, ২০টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ, ২টি শ্মশান সংস্কারের কাজ, বৈদুতিক চুল্লি, হাউস ফর অল প্রকল্পে ৪০০টি বাড়ি নির্মাণ, প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে জেলার প্রতিটি রাস্তায় এলইডি লাইট লাগানো, আরও অনেক কিছু।

ইতিমধ্যেই জেলার প্রতিটি এলাকা আজ সেজে উঠেছে উৎসবের আগমনে। আলিপুরদুয়ার পুরসভা মানুষের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্খাগুলি পূরণ করার জন্য মা দশভূজার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানায়। প্রত্যেকের আগামী দিনগুলি হয়ে উঠুক সুন্দর ও আনন্দময়।

শ্রীমতী রুমা চ্যাটার্জি
উপ-পুরপতি

আশীষ চন্দ্র দত্ত
পুরপতি

আলিপুরদুয়ার পৌরসভা

কলম সিং এবং পুজো পর্যটক

(ডুয়ার্স অরণ্য। কলম সিং বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্বক মহাতামাক টানিতেছেন। গাইড বুক পড়িতে পড়িতে পর্যটকের প্রবেশ)

পর্যটক ঃ (চমকে) আরে! কে আপনি? কেএলও নাকি?

কলম ঃ অর্বাচীন! ডুয়ার্স ভ্রমণে আসিয়াছ, কলম সিং-এর নাম শুনো নাই?

পর্যটক ঃ ইয়ে মানে গাইড বুকে তো লেখা নাহি! এই দেখুন!

কলম ঃ (তাচ্ছিল্য) থাক! ঘরে বসিয়া রচনা করিয়াছে। এইসব কুপুস্তক অবলোকনে পীড়া জন্মে।

পর্যটক ঃ কী উচ্চারণ করিতেছেন স্যার! ইহার রচয়িতা বিখ্যাত ডুয়ার্সজ্ঞ শ্রীমতি শালপাতা মুখার্জি। সম্প্রতি ইবন বতুতা পুরস্কার এবং রাজ্যশ্রী উপাধি লাভ করিয়াছে।

কলম ঃ তাহাতে কাহার পিতার কী আসে যায়! তা তোমার অভিপ্রায় শুনি? এত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ কেন? অরণ্য কি তোমার শ্বশুরালয়?

পর্যটক ঃ আমি ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে দুর্গাপূজা দেখিব। শালপাতাদেবী লিখিয়াছেন যে বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্বে ডুয়ার্সের গ্রামের দুর্গাপূজা বাঙালি সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর দিক।

কলমঃ লেখিকা প্রত্যহ কয় ছিলিম মহাতামাক ভস্ম করিয়া থাকেন?

পর্যটক ঃ কিছু মন্তব্য করিলেন কি?

কলম ঃ শুনো যখন নাই, তখন থাক। আর কী লিখিয়াছেন?

পর্যটক ঃ পূজার কয়েক সপ্তাহ আগে হইতে স্থানীয় রাজবংশী, আদিবাসী, নেপালি সম্প্রদায় আগমনী গীতের মূর্ছনায় আকাশ বাতাস...।

কলম ঃ থামো থামো। ইহার পর এই অরণ্যের কপিকুল অবধি হাসির দমকে মূর্ছা যাইবে। রাজবংশী ভাষায় আগমনী গীত! মস্করা হচ্ছে?

পর্যটক ঃ কেন? উহারা আগমনী গীতি উচ্চারণ করেন না? উহারা তো বাঙালি!

কলম ঃ (বিরক্ত) ইহাই হইল সমস্যা! বাঙালি হইলেই বুঝি ঘটা করিয়া দুর্গাপূজা করিতে হইবে? রাজবংশীদের দুর্গাপূজা লইয়া বিশেষ মাথাব্যথা নাই। উহারা বিজয়া একাদশীর দিন ভান্ডারনীর পূজা করে। তিনি অবশ্য দুর্গা বটে।

পর্যটক ঃ (বিস্মিত) কিন্তু দশমীতেই তো দুর্গাপূজা শেষ। উক্ত দিন দেবী সন্তানাদি সহ শ্বশুরবাড়ি চলিয়া যান।

কলম ঃ জানি। এই পথ দিয়াই তো যান।

পর্যটক ঃ এই পথ দিয়া কৈলাসে? তাহা কী করিয়া সম্ভব?

কলম ঃ (বিরক্ত) ভূগোলে মাধ্যমিকে কত পাইয়াছিলে কহ তো!

পর্যটক ঃ (গর্বিত স্বরে) লেটার!

কলম ঃ টুকিয়া পাইয়াছিলে। তুমি নিশ্চই ভাবিয়া ছিলে যে দেবী বাঘমুন্ডি পাহাড় টপকাইয়া স্বামীর নিকট গমন করে!

পর্যটক ঃ (বিস্মিত) ভুল ভাবিয়াছিলাম?

কলম ঃ মহাতামাক না টানিয়া এইরূপ ভাবনা কী করিয়া ভাবো কহ দেখি! এইস্থান দিয়া, চালসা-ভুটান হইয়া গিরিপথ দিয়া হিমালয় টপকাইয়া চিনের প্রাচীরের পাশ দিয়ে কৈলাসে যাইতেন। ইদানীং রুট কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথম যেদিন ফিরিতেছিলেন, সেদিন বর্তমান আলিপুরদুয়ারের নিকট স্থানীয় লোকজন পথ অবরোধ করিয়া তাঁহাকে থামাইয়াছিল।

পর্যটক ঃ আশ্চর্য! পথ অবরোধ! আপনি যথার্থ জানেন তো?

কলম ঃ আমার পূর্বপুরুষ ধুতরো সিং উক্ত অবরোধে স্থানীয় গ্রাম হইতে নেতৃত্ব দিয়াছিল।

পর্যটক ঃ তাই নাকি!! তা দেবী থামিলেন?

কলম ঃ না থামিবার কী আছে! এটা তো তাঁর স্বামীরই রাজ্যপাট। তা তিনি কেবল থামেন নাই। স্থানীয় রাজবংশীদের অনুরোধে একদিন এখানে থাকিয়া তারপর কৈলাস গমন করিয়াছিলেন। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলিতেছে।

পর্যটক ঃ আপনি তো বেশ জ্ঞানী ব্যক্তি স্যার!

কলম ঃ (প্রসন্ন হইলেন) সেই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের যুগ হইতে আমাদের পরিবার ডুয়ার্সে বাস করিয়া আসিতেছে বলিয়াই এইরূপ জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছে। ইহা পাণ্ডববর্জিত দেশ বলিয়া পাণ্ডবেরা আজও বিশেষ কিছু জানিতে পারে নাই।

পর্যটক ঃ কিন্তু আগমনী গান লিখিল না কেন?

কলম ঃ গর্দভ! দেবী দুর্গা ডুয়ার্সে প্রায়ই গমনাগমন করিয়া থাকেন। পক্ষকাল পূর্বেই সরস্বতীর সহিত পুষ্পক রথে কামাক্ষ্যা-জল্পেশ টুর করিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘায় তিন দিবস অবস্থান পূর্বক কৈলাসে ফিরিয়াছেন। পূজার পর আবার আসিবেন। নিয়মিত গমনাগমন থাকিলে আগমন উপলক্ষে গীতি রচনা করিয়া কী লাভ? বাঙালির তুমি কতটুকু জানো হে ছোকরা?

পর্যটক ঃ কিন্তু কেবল সরস্বতীকে লইয়া কেন?

কলম ঃ ডুয়ার্সে মাধ্যমিকের ফলাফল অতি শোচনীয় হইতেছে। ইহার কারণ সম্ভবত হনুমানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি।

পর্যটক ঃ কিন্তু শালপাতাদেবী এইসব লিখিলেন না কেন?

কলম ঃ উনি হয় পাণ্ডব অথবা মহাতামাকসেবিকা। ঘরে বসিয়া গুগুল্ আর্থ দেখিয়া লিখিলেও এইরূপ ঘটা সম্ভব।

পর্যটক ঃ অতীতে আদিবাসীরা দুর্গাপূজা করিত না এতদাঞ্চলে?

কলম ঃ ওহে গর্দভ! আদিবাসীরা চা উদ্যানে শ্রম দিবার নিমিত্তে ভিন্নাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। উহারা করম্‌পূজায় আহ্লাদ করিয়া থাকে। উহাদের দুর্গাপূজায় বোনাস প্রদানটা বাবুদের কীর্তি। অতীতে বোনাস পাইয়া টাউনে আসিয়া মূল্যবান যন্ত্র-বস্ত্র-পাদুকা ক্রয় করিত। দেখিয়া টাউনের বাবুদের চক্ষু বক্র হইয়া যাইত। পূজার পর স্থানীয় হাটে জলের দরে বেচিয়া দিত। আমি আগে উক্ত দ্রব্য কিনিয়া লইয়া টাউনে দেড়শো শতাংশ লাভে বেচিতাম।

পর্যটক ঃ কিন্তু আসিবার কালে একখানি গ্রামে পূজার বৃহদায়তন মন্ডপ দেখিলাম কেন?

কলম ঃ দক্ষিণ ধুয়াঝারি গ্রাম তো? চার দশক পূর্বে উক্ত গ্রামের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। বাংলা দেশ হইতে অনুপ্রবেশকারী আসিয়া গ্রাম বানাইয়াছে। ইহাদের ঢাকাইয়া কহে। বলিতে পারো যে ঢাকাইয়া প্রধান গ্রামে দুর্গার আরাধনা হইয়া থাকে। রাজবংশী প্রধান গ্রামগুলিতে দুই একখানি হইতেছে বটে কিন্তু সত্যকার বলিতে চাহ তো, ভান্ডারনী হইল ডুয়ার্সের আদি বসবাসকারী মনুষ্যদের প্রকৃত দুর্গাপূজা। ইহা পাণ্ডবদের জানিবার বিষয় নহে। উহারা তো করতোয়া দেখিয়াই ভাগিয়াছিল। ডুয়ার্সে পূজার মোচ্ছব বুঝিতে হইলে কালীপূজার কালে আসিও।

(সহসা ঝোপের আড়াল হইতে একখানি নিরামিষ সর্প আংশিক নির্গত হইয়া লেন্সের একেবারে নিকটে আসিয়া জিহ্বা নির্গত করিল)

পর্যটক ঃ হে পিতঃ! ড্রাগনঃ! (ক্যামেরা, গাইড বুক ইত্যাদি ফেলিয়া পলায়ন)

কলম ঃ (বিস্মিত) ড্রাগন শব্দের উচ্চারণ শুনিলাম! উহা কোথা হইতে আসিবে?

পর্যটক ঃ আমি আপনার কথা ভ্রমণ কাহিনিতে লিখিব। যদি অনুমতি প্রদান করেন তো একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করি। চিত্রের বিনিময়ে আপনাকে পাঁচশত টাকা দক্ষিণা দিব।

কলম ঃ (খুশি হইয়া) ছিলিমি সাজাইয়া লই?

পর্যটক ঃ (আতঙ্কিত) না না! ছিলিম চলিবে না! আমি ক্লোজ আপ লইব। (ক্যামেরা তাক করণ) যদিও আলোকের বিপরীতে আপনার অবস্থান, কিন্তু আমার এই চিত্রগ্রহণ যন্ত্র অতি মূল্যবান এবং উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন। (একটু চমকাইয়া) আরে! আপনার পশ্চাতে লতাগুল্মের নিকট কিছু প্রত্যক্ষ করিলাম মনে হইল। (অগ্রসর হওন) কিছু একটা দৃষ্টিতে আসিতেছে। (ঝুঁকিয়া, ঝোপ লক্ষ্য করিয়া ক্যামেরাপাত) অহো! কী উজ্জ্বল দুইখানি মণি! ইহা কী হইতে পারে!

(সর্প দেখিয়া) বুঝিয়াছি! লেন্সের শক্তি এই নিরীহ জীবটিকে ভয়ংকর ড্রাগনে পরিণত করিয়াছে! (সর্পকে) উপযুক্ত কালে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ বৎস্য! পাঁচশত টাকা না পাইলেও (ক্যামেরা তুলিয়া) এই যন্ত্র বিক্রয় করিয়া পূজায় ভালোই বিলাস করিতে পারিব। আর এই হইল শালপাতাদেবী বিরচিত পুস্তক। (উল্টাইয়া) বাহ! লেখিকা নিজের দূরভাষ সংখ্যা দিয়া মতামত জানাইতে বলিয়াছেন। ভালো ভালো! এক্ষণে ভুল ধরিয়া ব্ল্যাকমেল করিব। অহো! কাহার মুখ দর্শন পূর্বক যে শয্যাত্যাগ করিয়াছিলাম। ডুয়ার্সে দুর্গা আসিবেন, তাহার নিমিত্তে নাকি আগমনী লিখিতে হইবে। কী বুদ্ধি! খ্যাঁক খ্যাঁক খ্যাঁক...

(ফিচেলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সংকটে উত্তরের বন্যপ্রাণ

আদৌ কি শঙ্কিত আমরা ?

বন মন্ত্রী একা কতটা পারবেন? বিধায়করাও শামিল হোন!

বন্য প্রাণ তো ভোট দিতে পারে না। তাই তাদের নিয়ে ভাবার সময় নেই কোনও নেতার— মিটিং, সংগঠন, গোষ্ঠীকোন্দল সামলাতেই তাঁদের সময় বেরিয়ে যায়। জঙ্গল বোঝার ক্ষমতা এইসব নেতা-মন্ত্রীর থাকার কথা নয়— তা সে যে আমলেরই হোন না কেন। বন দপ্তরের ছোট, মাঝারি ও বড় মাপের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আগাগোড়াই এই ধরনের মন্তব্য শোনা যায়। সেই কারণেই দেখা যায়, রাজ্যের বন মন্ত্রীরা নাকি দপ্তরের রোজকার কাজকর্মে নাক গলান কম। সাধারণত উদ্‌বোধন, পরিদর্শন ইত্যাদি কাজ ছাড়া বন জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর মতে, হেলমেট না পরলে তেল দেওয়া যাবে না বা মাঠে প্রাতঃকৃত্য সারলে বিনে পয়সার বাথরুম মিলবে না— এসব আইন কার্যকর হচ্ছে দ্রুত, কিন্তু কাঠ কাটা বা পশুপাখি মারা নিয়ে কোনও পুরস্কারমূলক আইন কার্যকর নেই— নেতাদের এতে আগ্রহ নেই বলেই। বন সংলগ্ন গ্রামগুলোতে বাসিন্দাদের বনপাহারায় উৎসাহিত করার জন্য নানাবিধ উপায় আছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোকে সর্বত্র জনপ্রিয় করার ব্যাপারে কড়া হতে পারেন বন মন্ত্রীই। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক'ঘণ্টা তিনি রোজ জঙ্গলের জন্য দিতে পারেন? সত্যিই যদি তাঁর পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে জঙ্গল এলাকায় বিধায়কদের এ ব্যাপারে

> গরুমারায় গন্ডার নিধন হলে কেন মাল বিধায়ককে জবাবদিহি করতে হবে না? কিংবা শালকুমারে হাতি হত্যা হলে কেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ককে তলব করা হবে না? মানুষ ভোট দেয় বলে তিনি কি কেবল মানুষেরই বিধায়ক? এলাকার গাছপালা পশুপাখির নন?

মন্ত্রীর পদটাই নাকি আদপে আলংকারিক। যেমন এখন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, বন মন্ত্রীকে উত্তরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের হতে হবে— সেটাই তাঁর একমাত্র যোগ্যতা। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাঁর পূর্বসূরিদের অনুকরণ করাই শ্রেয় মনে করেছেন। অবশ্য জঙ্গল বা ওয়াইল্ডলাইফ বোঝেন এমন অফিসারও বন দপ্তরে এখন হাতে গোনা, সে অভিযোগও মিলছে দপ্তরের আনাচকানাচে। বিশেষ করে নিচুতলার বনকর্মীদের অভিমত তো তা-ই। তাঁদের মতে, নামমাত্র কয়েকজন অফিসার আছেন, যাঁরা সত্যিই জঙ্গলকে ভালোবাসেন এবং জঙ্গলের সমস্যা বোঝেন। বাকিদের বেশির ভাগই অসৎ, কর্মভীরু, আরামের চাকরি পাওয়ার জন্য লবিবাজি করে যান। বন্য প্রাণের এমন বিপন্ন অবস্থায় তাঁদের যে মাথাব্যথা থাকবে না, সেটাই তো স্বাভাবিক।

জঙ্গল থেকে যে সরাসরি কিছু মেলে না— এ কথা অস্বীকার করতে পারেন না রাজনৈতিক কর্তারা। আর কিছু না পারুন, মানুষকে সচেতন করার 'মহান' দায়িত্বটুকু তাঁরা কাঁধে তুলে নিতে পারতেন, তাঁদের দেখে বনাধিকারিক ও কর্মীরাও সচেতনতা প্রচারে যোগ দিতে পারেন উৎসাহী হয়েই, এমনটাই মনে করেন বন্য প্রাণ শাখার

দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন? গোরুমারায় গন্ডার নিধন হলে কেন মাল বিধায়ককে জবাবদিহি করতে হবে না? কিংবা শালকুমারে হাতি হত্যা হলে কেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ককে তলব করা হবে না? মানুষ ভোট দেয় বলে তিনি কি কেবল মানুষেরই বিধায়ক? এলাকার গাছপালা, পশুপাখির নন? যতদিন না নিজ এলাকার বনসম্পদ নিয়ে জনপ্রতিনিধিরা উত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছেন, ততদিন বন মন্ত্রী বা বনপালের যাবতীয় ভাবনা বা বিবৃতি কাগজে-কলমেই থেকে যাবে। আর প্রতি বছর ঘটা করে পালিত হবে অরণ্য দিবস বা বন্য প্রাণ সপ্তাহ।

বনকর্মীর অভাব মিটবে এবার?

সরকার স্বাভাবিকভাবেই বলবেন, কোনও কর্মীর অভাব নেই। কারণ, অভাব আছে বললেই কর্মসংস্থানের দায়িত্বও এসে পড়বে সরকারের কাঁধেই। অতএব সরকারি বিবৃতি তোলাই থাক, আসল সমস্যা, অভিজ্ঞ বনকর্মীর সংখ্যা কমছে। যাঁদের বয়স বাড়ছে, তাঁরা শারীরিক পটুত্ব হারাচ্ছেন, অথচ জঙ্গলে নজরদারির ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিবর্ত ক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি। শহরে লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ওঠা তরুণ-তরুণী জঙ্গলে চাকরি নিয়ে এলেও জঙ্গলের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা যথেষ্ট কঠিন। জঙ্গল, পশুপাখির প্রতি সত্যিকারের টান না থাকলে, শীতে-বর্ষায় পায়ে হেঁটে বনরক্ষার দায়িত্ব পালন করা যথেষ্ট কষ্টকর বইকি। সে ক্ষেত্রে জঙ্গল সংলগ্ন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা ছেলেটি যদি সেই চাকরি পায়, তবে তার কাছ থেকে পরিষেবা স্বভাবতই অনেক বেশি মিলবে। কাশ্মীরের যুবকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ যদি সেখানকার সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করতে পারে, তবে বনাঞ্চলের যুবক-যুবতীদের বনরক্ষীর চাকরিও জঙ্গলের মঙ্গল সাধন করতে পারে। অথচ এতদিন স্টাফ সিলেকশন কমিশন-এর অধীনে মেধাভিত্তিক কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা থাকায় সেই সুযোগ মেলেনি। ইদানীং সেই সমস্যা অনুধাবন করেই নাকি যথাযথ হস্তক্ষেপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এবার যদি বনকর্মীর অপ্রতুলতার সুরাহা কিছু হয়— এমনটাই আশা ব্যক্ত করলেন উত্তরের এক বনাধিকারিক। তিনি বললেন, এই মুহূর্তে অন্তত ২০০০ ফরেস্ট গার্ড প্রয়োজন, কিন্তু নিলেই তো হবে না, তাদের মাইনের ব্যবস্থাও তো করতে হবে— তাই আপাতত সাড়ে তিনশো মতো নেওয়া হবে। তবে তাঁর

হারানো বনভূমি

ডিভিশন	জমির পরিমাণ (হেক্টর)
কোচবিহার	৯৭৯.৯৯০
মালদা	২৬২.০০০
জলপাইগুড়ি	১৪১.২০০
বিটিআর (পূর্ব)	৯৮.৫১৪
ওয়াইল্ড লাইফ-১	৬৩.৯৫০
দার্জিলিং	৪২.৪৪০
ওয়াইল্ড লাইফ-২	৩৪.৯০০
রায়গঞ্জ	৬.৯৩০
কার্শিয়াং	১.৫২০

সূত্র: রাজ্য বনদপ্তর

হাতির হামলায় মানুষের মৃত্যু

রাজ্য	মৃত্যুর সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৯৮২
ঝাড়খণ্ড	৭৭৯
আসাম	৭১৭
কর্ণাটক	৫০৯
ওড়িশা	৪৯৩
তামিলনাড়ু	২০৪
কেরল	১০৩
অন্যান্য	৩০৫
সারা ভারতে	৪০৯২

সূত্র: প্রজেক্ট এলিফ্যান্ট। ১৯৯১-৯২ ও ২০০৬-০৭ সালের মধ্যে

লেপার্ড
মৃত্যুর সংখ্যা ২২৬

চামড়া বাজেয়াপ্ত	৬০ শতাংশ
লেপার্ডের মৃত্যু	৪০ শতাংশ
পিটিয়ে মৃত্যু	৮ শতাংশ
ফাঁদে মৃত্যু	৭ শতাংশ
বিষক্রিয়ায়	৪ শতাংশ
সড়ক দুর্ঘটনায়	৩ শতাংশ
বনরক্ষীদের গুলিতে	৩ শতাংশ
অজানা কারণে	১৫ শতাংশ

মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২২৬টি ধরে শতাংশের হিসাব করা হয়েছে

মতে, কেবল কর্মী নিয়োগ করলেই হবে না, আধুনিক প্রযুক্তিতেও তাদের প্রশিক্ষিত হতে হবে দ্রুত। সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে নিয়োগকর্তাদের।

সংঘাত ক্রমবর্ধমান: নাজেহাল বন দপ্তর কি অসহায় বোধ করছে?

এই সংঘাত অনিবার্য ছিল, এবং ভবিষ্যতে তা আরও কঠিন আকার ধারণ করবে। সেরকমই ধারণা বন বিশেষজ্ঞদের। রোজ পৃথিবীর নানা প্রান্তে নাকি এই নিয়েই চলছে বিজ্ঞানীদের আলোচনাসভা। বলাই বাহুল্য, উত্তরবঙ্গের মানুষ-পশু সংঘাত সেইসব আলোচনায় বড়সড় অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি দুটো তথ্য দেখলেই (যদিও এই তথ্য কয়েক বছরের পুরনো) দেখা যায়, কী হারে কমছে বন্য প্রাণের জঙ্গল আর তার পাশাপাশি বন্য প্রাণের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু। যাঁরা এর উত্তরে বলবেন বনসৃজনের কথা, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, কাগজে-কলমে সবুজের আয়তন সাকুল্যে হয়ত কমছে না, বরং বাড়ছেই, কিন্তু তবু সে বনায়ন বন্য প্রাণের যুগের পর যুগ ধরে পরিচিত বাসস্থানের কখনও কোনওভাবেই পরিপূরক হতে পারে না। জঙ্গলের দিকে মানুষের বসবাস যত এগিয়েছে, ততই পিছিয়ে যাচ্ছে বন্য প্রাণ। একসময় তারা পগারপার হচ্ছে, আর বাকিরা নিরুপায় হয়ে ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে, কখনও দলছুট হয়ে, কখনও খাদ্যের সন্ধানে, কখনও তীব্র আক্রোশে। উত্তরের বিশালকায় বন্য প্রাণ হাতি, গন্ডার, বাইসন ও লেপার্ড সংখ্যায় বাড়ছে। এদের জঙ্গলের সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখাই এখন কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে ছাড়ছে না চোরাশিকারির নেটওয়ার্ক। উত্তরের জঙ্গল সীমান্তবর্তী এলাকায় হওয়ায় তাদের আরও পোয়াবারো। অবস্থা ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো। জানোয়ারের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে, তার উপর চোরাশিকারিদের ঘন ঘন হানা— কী যে নাজেহাল পরিস্থিতি বন দপ্তরের হয়েছে, তা সাধারণ মানুষকে বলে বোঝানো যাবে না। হতাশ সুরেই জঙ্গলের করুণ কাহিনি ব্যক্ত করলেন উত্তরের এক রেঞ্জ অফিসার।

চোরাশিকারিরা ছিল, আছে, থাকবে

গত একশো বছরের রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যাবে, ১৯২০ সালে ডুয়ার্সের জঙ্গলে গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২০০-র আশপাশে। অথচ ১৯৩২ সালে সে সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৫-৫০-এ। ছয়ের দশকে সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায় ঠিকই, ১৯৬৬-৬৭ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ছিল ৭৬। কিন্তু ১৯৮০ সালে তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে নেমে আসে ১৪-য়। এর পর সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্ব জুড়ে হইচই শুরু হয়। পোচিং বিরোধী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদির ফলে গন্ডারের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৯৯৮-এ তা দাঁড়ায় ৪২-এ। বর্তমানে তা আবার ২০০ অতিক্রম করেছে।

এই তথ্য কখনওই প্রমাণ করে না, পোচিং বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বরং ২০১৬ সালেই গোটা সাতেক গন্ডার নামিয়ে দিয়ে পোচাররা আবার জানান দিয়েছে, আমরা ছিলাম, আছি, থাকব। গত তিরিশ বছরের ঘটনাপঞ্জির উপর নজর বুলিয়ে নিলেই এই সত্য আরও একবার প্রমাণিত হতে পারে।

মার্চ, ১৯৮৩ চোরাশিকারিদের গুলিতে প্রাণ হারান বনরক্ষী বিশ্বনাথ মুখার্জি, শঙ্কিত হয়ে ওঠেন বনরক্ষীরা।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪ ময়রাডাঙার বিট অফিসার গুলি করে মারেন এক চোরাশিকারিকে। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন গ্রামবাসী। তাঁদের হুমকিতে জলদাপাড়া ছেড়ে চলে যেতে হয় সেই বিট অফিসারকে।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শম্বর মেরে মাংস খাওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন শিলতোর্সা বিটের বনকর্মীরা।

এপ্রিল ২০০৯ বার্কিং ডিয়ার চোরাশিকারের দায়ে শোকজ হন বিট অফিসার-সহ চার কর্মী।

অক্টোবর ২০০৯ ন'বছর বাদে ফের গন্ডার হত্যা। পুলিশি কায়দায় 'খোঁচড়' নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ডিএফও-দের হাতে দেওয়া হবে এ বাবদ গোপন ফান্ড।

নভেম্বর ২০১৩ চোরাশিকারিদের হাতে বক্সা ও কালিম্পং জঙ্গলে চার-চারটে হাতির পরপর মৃত্যু নাড়িয়ে দিল বন দপ্তরকে।

ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সশস্ত্র সীমাবল, সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনী, সিআইডি ও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সাতজনের দল তৈরি হল, যাঁদের কাজ হবে চোরাশিকারিদের নজরদারিতে স্থানীয় মানুষকে অংশগ্রহণ করানো। আসাম সরকার ইতিমধ্যে চোরাশিকারিদের দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশ দিলেও এ ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজি নয়। বন মন্ত্রীর কথায়, আমাদের বন সংলগ্ন বাসিন্দাদের উপর যথেষ্ট আস্থা আছে। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা পাকড়াও করলেন পাঁচ চোরাশিকারির দলকে, যাদের সঙ্গে ছিল গন্ডারের খড়্গ। গত এক বছরে ডজনখানেক চোরাশিকারের পর এই প্রথম সাফল্য বলা যায়।

এপ্রিল ২০১৫ লেপার্ডের চামড়া ও কিছু হাড়সহ ওদলাবাড়িতে দুই ভুটানি নাগরিক ধৃত। লেপার্ড শিকারের খবরও ইদানীং মিলতে শুরু করে।

ডিসেম্বর ২০১৫ চার চোরাশিকারি ধরা পড়ল বীরপাড়ায়, সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল, গুলি, ২ কেজি ওজনের হাতির দাঁত এবং গন্ডারের খড়্গ কাটার কুঠার। এরা সব আসাম ও অরুণাচলের বাসিন্দা।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কার্শিয়াং ডিভিশনের অন্তর্গত সুকনার জঙ্গলে গন্ডারের মৃত্যুর কিনারা করতে শুরু হল সিআইডি তদন্ত। এর আগে জলদাপাড়ার জঙ্গলের গন্ডার হত্যা নিয়ে সিআইডি-র জালে ধরা পড়ল আন্তর্জাতিক র‍্যাকেটের এক চোরাশিকারি।

জুলাই ২০১৬ বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত নারারথলি অঞ্চলের আদিবাসী যুবক দিনকয়েক আগে একটি হাতি মারার অভিযোগে ধরা পড়ল এসএসবি-র হাতে, যার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে লেপার্ডের চামড়াও। অন্য দিকে গোরুমারার জঙ্গলে ২২ বছর পর গন্ডার হত্যা চোরাশিকারিদের হাতে।

সেপ্টেম্বর ২০১৬ হাসিমারায় পাকড়াও ভুটাননিবাসী চার পাচারকারী, সঙ্গে গন্ডারের শিং এবং তক্ষক। আসল পাচারকারী অবশ্য গা-ঢাকা দিয়েছে।

এ কথা মানতেই হবে, চোরাশিকারিরা যতটাই সক্রিয়, তেমনই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসনও। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এ কাজ একা বনরক্ষীদের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। পুলিশ, কাস্টমস, সশস্ত্র সীমা বল, আরপিএফ, বিএসএফ এবং সেনাবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে পোচিং-এর নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রশ্নই ওঠে না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বাহিনীগুলো যতটা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে সজাগ থাকবে, ততই থমকে যাবে চোরাশিকারিরা। রাজনৈতিক প্রশ্রয়কে যতটা দূরে রাখা যাবে, বন দপ্তরের হাসি তত চওড়া হবে সন্দেহ নেই।

গাইডলাইনহীন 'ইকো টুরিজম' বন্য প্রাণ সুরক্ষায় বাধা

মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকার মনেপ্রাণে চান উত্তরবঙ্গে পর্যটনের জোয়ার আসুক। পর্যটনই শিল্পহীন উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড় শিল্প হয়ে উঠতে পারে। উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি মহান ভাবনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যেখানে নিরানব্বই শতাংশ পর্যটন অরণ্যভিত্তিক, সেখানে 'ইকো টুরিজম'-এর অর্থই মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। বন দপ্তর যে নিজেরাও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে প্রকৃতিরক্ষার পর্যটন নিয়ে কোনও গণ্ডিরেখা টেনেছে তা-ও নয়। ইকো টুরিজম বোর্ড গঠন নিয়ে এগলেও ইকো টুরিজম নিয়ে কোনও পলিসি বা গাইডলাইন প্রণয়ন না হওয়ায় যথেচ্ছাচার চলছে সর্বত্রই।

ইকো টুরিজম নীতি যদি বন সাফারি, বনবাংলোয় থাকা পর্যটকের গতিবিধি, আচরণ সংশোধন না করতে পারে, তবে পর্যটন বাণিজ্যে বন দপ্তরের রাজস্ব সংস্থান হবে ঠিকই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বন্য প্রাণের দেখা না মিললে এই পর্যটকরাই আর এমুখো হবেন না। বেঙ্গল সাফারি পার্ক সেইদিকে নিঃসন্দেহে একটি বড় পদক্ষেপ— যেখানে অধিকাংশ মানুষ বন্য পরিবেশে বন্য প্রাণ দেখার তেষ্টা মেটাবে। কিন্তু একইভাবে 'কোর এরিয়া' থেকে দূরে জঙ্গলের পরিবেশে যেসব নান্দনিক স্পট আছে, সেগুলোতেই নানারকম রোমাঞ্চকর কার্যকলাপ পর্যটককে আটকে রাখতে পারে দু'-তিন দিনের ছোট্ট ছুটিতে। বলাই বাহুল্য, এই ইকো টুরিজম নিয়ে ডুয়ার্সের গোরুমারা একসময় গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছিল। অথচ এখনও সেই ডুয়ার্সেই ইকো টুরিজম প্রশাসন ও নীতি চালু হল না।

মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাত প্রমুখ রাজ্য দেখিয়েছে আলাদা ইকো টুরিজম বোর্ড। বনের ইকো ক্যাম্পগুলো প্রোমোশনের ভার তুলে দিয়েছে পর্যটন দপ্তরের হাতে, আর সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে বনবস্তির যুবকদের নিয়ে তৈরি যৌথ বনরক্ষা কমিটির হাতে। আমরাও তো সেইরকম নীতিতেই এগতে পারি।

আজকাল ডুয়ার্সের জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে বহু পর্যটককেই হতাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁদেরকে এই সত্য মেনে নিতেই হবে, জঙ্গলের মানুষের দলবদ্ধ অনিয়ন্ত্রিত আচরণ বন্য প্রাণকে সন্ত্রস্ত করে তোলে, 'পিক সিজন'-এ তা অসহনীয় অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। 'ইকো টুরিজম'-এর নামে পর্যটন বাণিজ্যের প্রসারে নিয়ন্ত্রণরেখা না টানলে, জঙ্গল সাফারির বিকল্প সন্ধান না দিলে অদূর ভবিষ্যতে পর্যটককে হতাশ হতে হবে আরও বেশি। বন্য প্রাণ সুরক্ষা মানে আপাতত চোরাশিকারির মোকাবিলা এবং সেটাই যদি প্রধান কর্মসূচি হয় বন দপ্তরের, তবে পর্যটন প্রসারে 'ইকো টুরিজম' নিয়ে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনচেতনা। পর্যটক শৃঙ্খলাবদ্ধ না হলে বন্য প্রাণ সংরক্ষণে বাধা পড়বেই বারংবার।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

হাজার প্রতিকূলতা তবু হাল ছাড়তে রাজি নই

মুখোমুখি বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন

প্রশ্ন- রাজ্যের বন্য প্রাণসম্পদ ভীষণরকম অসুরক্ষিত। সুন্দরবন বা বাঁকুড়ার জঙ্গল কিংবা উত্তরের হিমালয় বা ডুয়ার্সের অরণ্য— কোথাও প্রতিকূল প্রকৃতি, আবার কোথাও চোরাশিকারি— বন্য প্রাণ সর্বত্র বিপন্ন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন সোসাইটির রিপোর্ট একাধিকবার সেই ইঙ্গিত দিয়েছে। অথচ এই রাজ্যের জীববৈচিত্র দেশের মধ্যে একটা বড় স্থান নিয়ে আছে।

রাজ্যের একজন বনকর্তা হিসেবে আপনি কি এই সত্যিটা অস্বীকার করতে পারবেন? সাধারণ বনকর্মীরা কিন্তু কেউ এ কথা অস্বীকার করছেন না।

কর্মীবলের অভাবই কি আপনার একমাত্র যুক্তি? নাকি দপ্তরের উপরমহল খানিকটা দায় নিতে পারে?

প্রশাসনিক গাফিলতি নেই— এ কথা কি জোর দিয়ে বলতে পারবেন?

উত্তর- আমি যে সময় থেকে বন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছি, তখন থেকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি দুটো জিনিসের উপর— এক, আমাদের জঙ্গলের পরিমাণটা বাড়াতে হবে। আর দুই, বন্য প্রাণ রক্ষা করার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগচ্ছি। চোরাকারবারিদের রোধ করার জন্য আমাদের আগে যা যা ছিল, তার থেকে অনেক বেশি উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আমার সময় থেকে সারা

রাজ্যব্যাপী একটা ক্রাইম কনট্রোল ইউনিট খুলেছি। দেখবেন, সেটাতে আমরা প্রচুর সাফল্য পেয়েছি। বাইরের থেকে ক্রিস্টাল আকারে যে বিষ আসছে পাচার হয়ে, আর কেউ ধরছে না, উত্তরবঙ্গে আমরা ধরছি। এটা কিন্তু আমাদের বড় সাফল্য। গন্ডার পোচিং এখন প্রায় বন্ধ হবার পথে। আমাদের সমস্যা অন্য জায়গায়। এখানে ডুয়ার্সের পূর্ব দিকে আসাম, উগ্রবাদী, দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য, আমরা যতগুলো ক্রাইম ধরেছি, তার বেশির ভাগই কিন্তু আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ বা মণিপুর থেকে আসা।

কর্মীর অভাবের কথা কিন্তু আমি মানতে পারছি না। কারণ, এটা শুধু বন দপ্তর বলে নয়, সব দপ্তরেই কর্মীর অভাব রয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মানসিকতার ব্যাপার। পরিকাঠামো থাকবে, আমি কিছু করব না, তেমন মানুষ যে নেই তা নয়, আবার আমার এমন অনেক অফিসার রয়েছেন, যাঁরা এই লোকবল নিয়েই অনেক কিছু করছেন। এই পরিকাঠামো নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা কিন্তু অনেক কেসে সফল হয়েছেন। কীভাবে আমরা জঙ্গল রক্ষা করব, কীভাবে বন্য প্রাণ রক্ষা করব, তার রাস্তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছেন যৌথ বন উদ্যোগ কমিটি তৈরি করে। এর মাধ্যমে আমরা যথেষ্ট সাফল্য পেতে পারি, পাচ্ছিও। আমাদের ফরেস্ট ভিলেজারদের কাছে টানতে হবে। তাদের সাহায্যেই আমরা বন রক্ষা করব। জঙ্গলের অনেক জায়গায় বনবস্তির মানুষরাই কাউকে গাছ কাটতে দেয় না। তারা নিজেরাই বন রক্ষা করছে। যারা বলে স্টাফ কম, তা দায় এড়ানোর মতো কথা।

কর্মীর অভাবের কথা কিন্তু আমি মানতে পারছি না। কারণ, এটা শুধু বন দপ্তর বলে নয়, সব দপ্তরেই কর্মীর অভাব রয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মানসিকতার ব্যাপার। পরিকাঠামো থাকবে, আমি কিছু করব না, তেমন মানুষ যে নেই তা নয়, আবার আমার এমন অনেক অফিসার রয়েছেন, যাঁরা এই লোকবল নিয়েই অনেক কিছু করছেন।

আর এখানে প্রশাসনিক গাফিলতি নেই। বন দপ্তরের সব অফিসারই যথেষ্ট দক্ষ ও অভিজ্ঞ। সকলেই তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসেছেন।

প্রশ্ন- সঠিক পরিকল্পনার অভাব বলেই কি আজ এই অসহায় অবস্থা? এ নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও পলিসি আছে? যদি না থাকে, তবে সেরকম নীতি প্রণয়নের কথা ভাবা হয়েছে কি? বেআইনি গাছ কাটা ও চোরা পাচার নিয়ে এর আগে বন দপ্তরের কড়া পদক্ষেপ বহু ক্ষেত্রেই যথেষ্ট কাজে দিয়েছে। অথচ চোরাশিকার নিয়ে দপ্তর এখনও কঠোর হতে পারছে না কেন? ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন নিয়ে কোনও টাস্ক ফোর্স তৈরির কথা ভাবা যায় না?

উত্তর- বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বন দপ্তরের পরিকল্পনার যেমন কোনও অভাব নেই, তেমনি দপ্তর থেকে নানা পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেবার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু বহুবিধ। বোদাগঞ্জে আমরা ১,০০০টার বেশি গ্যাস সিলিন্ডার দিয়েছি বনবস্তির মানুষদের। তাদের বুঝিয়েছি, যাতে তারা গাছ না কাটে। ওরাই এখন আমাদের বন পাহারা দিচ্ছে, কেউ গাছ কাটতে গেলে তারা নিজেরাই বাধা দিচ্ছে। বোদাগঞ্জে গিয়ে দেখবেন, ওখানে কেউ গাছ কাটে না। একটা সাধারণ পরিবারে মাসে হাজার দেড়েক টাকার কাঠের প্রয়োজন। সেখানে একটা গ্যাসে কিন্তু তাদের সারা মাস চলে যাচ্ছে, টাকাও কম লাগছে, সময়ও কম লাগছে। আগামী দিনে উদ্যোগ নিচ্ছি বক্সাতে। সেখানে প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছি। এই টাকাটা সেখানে রয়্যালটি থেকে পাওয়া। আমরা গোটা টাকাটাই ওদের জন্য খরচ করব। ওখানেও প্রায় ১০,০০০ পরিবারকে আমরা বন দপ্তর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার ও আভেন দেব। তারা যখন একবার গ্যাসে রান্না করা শুরু করবে, তার কত সুবিধা সেটা বুঝবে, কত তাড়াতাড়ি রান্না হয়, ধোঁয়া ওঠে না, বাসনে কালি পড়ে না, বাসন মাজতে কষ্ট হয় না, তখন তারা আর জঙ্গলে যাবে না কাঠের জন্য। এতে বনের গাছও সুরক্ষিত থাকবে।

বনবস্তির মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্য আমরা সেখানের বিভিন্ন স্কুলে বসার চেয়ার, ছাত্রদের জন্য বেঞ্চ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওই এলাকায় হাটবাজার তৈরি করে দিচ্ছি, কোথাও স্টলেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এমনও হয়েছে, কিছু পরিবারের সংসার চলে না, তারা বনের উপর নির্ভরশীল, তাদের ২৫ শতাংশ শেয়ারের টাকায় বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ভ্যান কিনে দিয়েছি, কাউকে সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি, যাতে তারা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। এখানে পরিকল্পনার কোনও অভাব নেই। আসলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নগরায়ণ ঘটাতে গিয়ে আমরা এক সময় যথেচ্ছভাবে গাছ কেটে ফেলেছি, যার ফল নানাভাবে ভুগতে হচ্ছে।

একমাত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাদ দিয়ে অন্য সব প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বন যদি এতটাই অসুরক্ষিত থাকত, তবে কি আর বন্য প্রাণ বাড়তে পারত? ১৯৮২-৮৩ সালে থাকা ১৬ বা ১৮টা গন্ডার আজ বেড়ে ২৬০টায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে গন্ডারদের জন্য নতুন করে আবাসস্থল খুঁজতে হচ্ছে। কেন্দ্র থেকে পর্যবেক্ষক দল এসেছিল— বক্সা, পাতলাখাওয়াতে তা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। হাতি যা বেড়েছে তা আর বলার নয়, চিতা বাঘের ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। একটা বাঘকে থাকতে গেলে ২০ বর্গকিলোমিটার জায়গা লাগে। কিন্তু বক্সায় এই পরিবেশ নেই। সেখানে ২ কিলোমিটারের মধ্যে বনবস্তি গড়ে উঠেছে। একদম নিরাপদ স্থান না পেলে বাঘেরা প্রজনন করে না। ফলে তারা বংশবৃদ্ধিও করতে পারছে না। বাঘের সংখ্যা না বাড়ার এটা কিন্তু প্রধান কারণ। তাদের খাবারের কিন্তু অভাব নেই, বাইসন, হাতি বাঘের প্রধান খাদ্য। জঙ্গলে তার জোগান প্রচুর। শুধু পরিবেশের অভাব, আমরা তা পূরণ করার চেষ্টা করছি। বনবস্তির লোকেরা যদি স্বেচ্ছায় ওখান থেকে সরে যায়, তবেই তা সম্ভব, আমরা তো আর তাদের জোর করে সরাতে পারি না। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, যারা স্বেচ্ছায় সরে যাবে, প্রত্যেক পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, এবং তাদের যে জমি আছে, তার সমপরিমাণ জমি তাদের দেওয়া হবে। সেই এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল, বিদ্যুতের ব্যবস্থাও আমরা করে দেব। সুন্দরবনে ছোট ছোট বাঘ দেখতে পাবেন, কিন্তু এখানে পরিবেশ ঠিক না করতে পারলে বক্সায় বাঘ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আমাদের পরিকল্পনার যদি অভাব থাকত, তবে নিশ্চয়ই জঙ্গলে অন্যান্য জন্তুর সংখ্যা বাড়ত না।

বলতে খারাপ লাগছে, বামফ্রন্ট আমলে এরাই মানুষকে গাছ কাটার অভ্যাসটা শিখিয়েছে। আমি নাম বলব না, একজন মন্ত্রী বলেছিলেন, তোমরা মরা গাছ কেটে নাও। এতে মানুষ জঙ্গলে

ঢোকার ছাড়পত্র পেয়ে গেল। বায়োডাইভার্সিটি মানে কিন্তু শুধু বাঘ, হাতি, গন্ডার, হরিণ নয়, এর মানে হল, সেখানে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ থাকবে, ঝিঁঝিঁপোকা থাকবে, ডোরা পোকা থাকবে, পাখিরা থাকবে। পাখিদের খাবারের জন্য আমরা সব নার্সারিতে ১৫ শতাংশ ফলের গাছ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি, যাতে পাখিরা ইচ্ছেমতো ফল খেতে পারে। আবার বিভিন্ন কীটপতঙ্গও পাখিদের খাবার। জঙ্গলে একটা গাছ মরে গেলে সেটা পচে সেখানে ডোরা পোকা জন্মায়। এই কারণে এখন নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, জঙ্গলের কোনও মরা গাছ কাটা যাবে না। ওয়াইল্ডলাইফ এলাকায় কোনও গাছ মরে গেলে তা কাটা বেআইনি, ঝড়ে শাল গাছ পড়ে গেল, তাও কিন্তু ওখান থেকে তোলা যাবে না। ওখানে থাকবে, ওখানেই পচবে, পোকা হবে, পাখি খাবে। কিন্তু মানুষই তো এসব নিয়ম ভাঙে। আবার কাঠ পাচারকারীদের প্রতি আমরা কঠোর হয়েছি, তার জন্য কাঠ ব্যবসায়ী, যারা লাইসেন্স হোল্ডার, তাদের ব্যবসা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে। এর মধ্যেও তো প্রচুর কাঠ ধরা পড়ল। তবে শুধু আইন প্রয়োগ করে নয়, আমরা চাইছি মানুষকে বুঝিয়ে এ ব্যাপারে সচেতনতা আনতে। মানুষ যতদিন না সজাগ হবে, ততদিন কিছুই হবে না।

বর্তমানে চোরাশিকারও অনেকটা কনট্রোলে। গত ছ'মাসের মধ্যে দেখবেন, একটাও গন্ডার বা হাতি কিন্তু মারা যায়নি। যে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে তা ট্রেনের অ্যাক্সিডেন্টে। প্রায় দেড়শোরও বেশি চোরাকারবারি এখন জেলখানায় আছে। এদের মাথাকে নাগাল্যান্ড থেকে অ্যারেস্ট করেছি। এটা একটা বড় সাফল্য। পাচারকারী এক মহিলা, ভুটানের নাগরিক, তাকেও গ্রেপ্তার করেছি আমরা। আমরা যথেষ্ট সজাগ এবং সতর্ক।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন নিয়ে একটা ক্রাইম কনট্রোল ইউনিট আমরা ইতিমধ্যেই তৈরি করেছি। এর মাধ্যমেও আমরা বড় সাফল্য পেয়েছি। এই ইউনিটে পুলিশ ছাড়াও এসএসবি, বিএসএফ, ডিআইবি, কোস্টাল গার্ড রয়েছে। সবার সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমরা কাজ করছি। এর মধ্যেই জটেশ্বরের ওখানে রেইড করে ৩-৪ লক্ষ টাকার কাঠ আমরা উদ্ধার করেছি। এই কাজে এসএসবি আমাদের সঙ্গে ছিল। অনেকে বলে, আমাদের আর্মস নেই, কথাটা ঠিক নয়। যারা আমাদের সহযোগিতা করতে আসছে, তাদের কি আর্মসের অভাব আছে? তবে বন দপ্তরের আর্মস কেনার একটা উদ্যোগ নিয়েছি, হোম ডিপার্টমেন্ট পারমিশন দিলেই আমরা সেগুলো কিনতে পারব।

প্রশ্ন- অন্য রাজ্যগুলিতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন নিয়ে কী ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে তা সরেজমিনে দেখতে সেখানকার জাতীয় শিক্ষামূলক পর্যটনের কোনও ব্যবস্থা আছে কি? আপনি নিজে কোন কোন পার্ক ঘুরে দেখেছেন মন্ত্রী হবার পর?

উত্তর- আমাদের আইএসএস-এর অফিসাররা তো বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসেন, তাঁরা প্রত্যেকে নানা জায়গায় যান। তাঁরা আসাম, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ যাচ্ছেন, যেখানে ন্যাশনাল পার্ক আছে, সেখানে গিয়ে দেখে এসে আমাদের এখানে তার বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছেন।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমার নিজে কোথাও ঘুরে দেখার সুযোগ এখনও হয়নি। সে সুযোগ হবে কি না জানি না। এত চাপ আমাদের, একদিকে সংগঠন দেখতে হয়, দলকে না দেখলে চলবে না। দপ্তরের একটার পর একটা প্রোগ্রাম থাকে। অন্যান্য অনুষ্ঠান থাকে। মাসে দুটো ক্যাবিনেট মিটিং। কলকাতা যাওয়া-আসা এখান থেকে, বুঝতেই পারছেন। উত্তরকন্যায় মাসে দু'দিন মিটিং। এই করেই তো সময় চলে যায়। বেনারসে আমাদের কোচবিহারের ১৬ বিঘা জমি পড়ে আছে কালীবাড়ির কাছে দারুণ জায়গায়, যার দাম নাকি কয়েক হাজার কোটি টাকা। সেখানে যাবার কথা হয়েছিল গৌতম দেবের সঙ্গে। কিন্তু কেউ সময়ই করে উঠতে পারলাম না।

প্রশ্ন- অন্য রাজ্যগুলিতে দেখা যায়, প্রকৃতি নিয়ে কাজ করা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন-এর কাজে লাগানো হয়। পাশের রাজ্য আসামের কাজিরাঙাতে গন্ডার হত্যা রোধে সেখানকার দু'-একটি সংস্থা দারুণ কাজ করছে। অথচ আমাদের ডুয়ার্সে এরকম বেশ কয়েকটি সংস্থা থাকলেও, তাদের কাজে লাগাবার কথা ভাবা হয়নি আজ পর্যন্ত। অনেকেই বলে, এতে বন দপ্তরের ভিতরের দুর্নীতি ও দুর্বলতা সব ফাঁস হয়ে যাবে, সেই ভয়ে সংস্থাগুলিকে কাজে লাগালেও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় না।

শুধু আইন প্রয়োগ করে নয়, আমরা চাইছি মানুষকে বুঝিয়ে এ ব্যাপারে সচেতনতা আনতে। মানুষ যতদিন না সজাগ হবে, ততদিন কিছুই হবে না। বর্তমানে চোরাশিকারও অনেকটা কনট্রোলে। গত ছ'মাসের মধ্যে দেখবেন, একটাও গন্ডার বা হাতি কিন্তু মারা যায়নি। যে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে তা ট্রেনের অ্যাক্সিডেন্টে।

আপনি কি এই অভিযোগ রাজনৈতিক নেতাদের মতো 'পুরোপুরি ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দেবেন? নাকি একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন?

উত্তর- যেসব এনজিও এখানে আছে, আমরা তো তাদের নিয়েই গন্ডার সেন্সাস, হাতি সেন্সাস করি। বছরে আমাদের যে ক'টি প্রোগ্রাম হয়, আমরা তাদেরকেই বেশি গুরুত্ব দিই। স্টেট ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডে তারাই মেম্বার। তারা তো কখনও আমাদের এই ধরনের প্রস্তাব দেয়নি। শুধু বনবস্তির মানুষকে নয়, আমরা সবাইকে বলছি, আসুন, সবাই মিলে বন্য প্রাণ বাঁচাই। একশৃঙ্গ গন্ডার দেখাই যায় না। সারা বিশ্বে বন্য প্রাণ বিপন্ন। কাউকে তো আর জোর করে আনতে পারব না। আমরা আপনাদের মাধ্যমেও আবেদন জানাচ্ছি, আসুন, সবাই মিলে বন্য প্রাণীদের রক্ষা করি। সবার সহযোগিতা আমাদের দরকার আছে।

জলপাইগুড়ির স্নেহা নামে একটি এনজিও বন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করেছে তিন দিনব্যাপী। তাদের বলেছি, এবার শুধু জলপাইগুড়িতে নয়, রাজ্যের তিনটি জায়গায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করার জন্য। আমরা বন দপ্তর তো হাত বাড়িয়েই আছি। আপনারাও এগিয়ে আসুন।

প্রশ্ন- অন্য রাজ্যগুলিতে যেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন নিয়ে ভাল কাজ হচ্ছে, সেখানে দেখা যায়, জঙ্গলে ইকো টুরিজম করা হয় সংরক্ষণের প্রয়োজনেই— বাণিজ্য করবার জন্য নয়, যাতে জঙ্গলের আশপাশের মানুষের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হয়— যাতে তারা বেআইনি গাছ কাটা বা চোরাশিকারে লিপ্ত না হয়। (যেমন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাত, কেরালা। এর আগে আমাদের গোরুমারাতেও এই সাফল্য পাওয়া গিয়েছে)। এই তথ্য নিশ্চয়ই জানেন এবং এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই মানেন?

কিন্তু আমাদের রাজ্যের জঙ্গলে দেখা যায়, টুরিজম বন দপ্তরের

বন্য প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যকে আমাদের রপ্ত করতে হবে। বন্য প্রাণ যদি কিছু বলেন, তা এখনও পুরুলিয়াতে আছে। সেখানে হাতি, ভালুক প্রচুর আছে। আদিবাসীদের সংখ্যাও অনেক। দেখবেন তো, ক'টা হাতির সঙ্গে ওখানে মানুষের সংঘাত হয়। সেখানে বন্য প্রাণীকে ওরা ডিস্টার্ব করে না। তারা জানে জঙ্গলের পরিবেশে কীভাবে সহাবস্থান করতে হয়। পাশে বাঁকুড়ায় কিন্তু সংঘাত বেশি হয়। আমাদের এখানে সংঘাত হবার কারণ, এখানে কোনও হাতি বা বাইসন এলে আমরা হইচই করি।

একটি অন্যতম আয়ের উৎস। এখানে নিগমের যে নেচার কটেজগুলি রয়েছে, তার বেশির ভাগকেই হোটেল বললে ভুল হবে না। বাম-আমলেই বহু জায়গায় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে বা সম্প্রসারণ হয়েছে জঙ্গলের নিয়মকে কাঁচকলা দেখিয়ে, এই আমলেও তা বন্ধ হয়নি। ইকো সেন্সিটিভ জোন তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা নামেই। তার কাজ বা সুফল এখনও চোখে পড়েনি। এতে ক্ষতি হচ্ছে বন্য প্রাণের। তা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি?

ইকো টুরিজম নিয়ে সরকারের নীতি এখনও মানুষ জানতে পারল না। বন পর্যটন নিয়ে সাধারণ পর্যটক বা পর্যটন ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি কোনও কড়া নির্দেশিকা এখনও তৈরি হয়নি। অথচ বন্য প্রাণ বিঘ্নিত করে খোদ বন উন্নয়ন নিগম এখনও কী করে পর্যটন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই প্রশ্ন উঠেছে বাইরের নানা ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটিতে। রাজ্য সরকার খুব বেশি দিন ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করে চলতে পারবে না বলেই তাদের ধারণা। কারণ, অন্য কোনও রাজ্যেই বন উন্নয়ন নিগম এরকম হোটেল ব্যবসা করে না। এ নিয়ে আপনার সুচিন্তিত বক্তব্য জানতে চায় মানুষ।

উত্তর- তিনটি টি-এর উপর উত্তরবঙ্গের মানুষ নির্ভর করে আছে। বাংলার মানুষ আমাদের যখন সুযোগ করে দিল, তখন আমরা এই টুরিজম ব্যবসাটার আরও শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছি। কোর এলাকায় আগে যা ছিল, আমাদের সময় কিন্তু নতুন করে আর কোনও পাকা কটেজ তৈরি হয়নি। যতটুকু হয়েছে তা আইন মেনেই হয়েছে, আইনের বাইরে গিয়ে কিছু হয়নি।

এসব চিন্তা করেই আমাদের বেঙ্গল সাফারি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে পর্যটনেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, আবার বন্য প্রাণরাও সুরক্ষিত থাকে। আমরা এখন খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি হোম টুরিজমকে। এর মধ্যে সুকনাতে বন আধিকারিকদের নিয়ে একটা মিটিং করা হয়েছে। সেখানে আমি বলেছি হোম টুরিজমকে অগ্রাধিকার দিতে। এতে আমাদের কোনও পয়সা ইনভেস্ট হচ্ছে না। আমরা বনবস্তির মানুষদের বলছি, তোমরা তোমাদের একটা ঘর সুন্দর ও পরিষ্কার করে সাজিয়ে দাও। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা-বাথরুম আমরাই তৈরি করে দিচ্ছি পর্যটকদের। ম্যাডাম সে দিন উত্তরকন্যায় বসে বলেছেন ২ কোটি টাকা দিয়ে এই বাথরুম-পায়খানা তৈরি করে দেবার কথা। আমরা ওদের রান্নার একটা প্রশিক্ষণ দেব। কারণ, পর্যটকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসবে, তাদের খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী যাতে তারা রান্না করতে পারে— এসব করার জন্য আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এমনকি তাদের ঘর বুকিং-এর জন্য আমরা ওয়েবসাইটও খুলে দিয়েছি। এতে আমাকে নতুন করে কোথাও কটেজ তৈরি করতে হচ্ছে না, কিন্তু বনবস্তির মানুষের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠছে। তাদেরও একটা বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে, আর্থিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে। তারাই নিজের স্বার্থে বনকে পাহারা দিচ্ছে। নিজের তাগিদে বাঁচাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়ি পর্যটনশিল্পে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী। ওখানকার মানুষরাই বলছে, যদি আমাদের জঙ্গলই না থাকে, তবে সেখানে পর্যটনশিল্প কী করে বাঁচবে? এই উদ্যোগ যদি ২০-২২ বছর আগে নেওয়া হত, তবে আমাদের ডুয়ার্স আরও বেশি সবুজে ঢেকে যেত। এই মুহূর্তে ১২০ বা তার বেশি হোম টুরিজমই আছে আমাদের দার্জিলিং জেলায়। আমরা চাইছি এবার তা ডুয়ার্স এলাকায় ছড়িয়ে দিতে। সবাইকে বলছি এগিয়ে আসতে।

পর্যটকদের চাপে বন্য প্রাণের যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে, তার জন্যই কিন্তু আমাদের বেঙ্গল সাফারি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গকে পর্যটনশিল্পের একটা আঁতুড়ঘর তৈরি করতে চেয়েছেন। প্রায় ৫ লক্ষ পর্যটক প্রতি বছর উত্তরবঙ্গে ঢোকে। তাই শিলিগুড়ির শালুগারায় তৈরি হচ্ছে বেঙ্গল সাফারি নামে একটি উন্নতমানের ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল পার্ক। উত্তরবাংলায় যত বন্য প্রাণী, রয়েছে সবাইকে এই বেঙ্গল সাফারিতে আমরা রাখছি। নিজস্ব পরিবেশে মাত্র দু'ঘণ্টায় পর্যটকরা তাদের দেখতে পারবে। সেখানে আমরা তৃণভোজী প্রাণী ছেড়ে দিয়েছি। তাদের চারটি সাফারি শুরুও হয়ে গিয়েছে। এই ডিসেম্বরের মধ্যেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছেড়ে দেব। ২০ হেক্টরের মধ্যে ৪টি বাঘ ছাড়া হবে। ৬টার বেশি ছাড়া যাবে না। শুধু বাঘের খাঁচা তৈরির কাজ শেষ হয়নি, ২ কিলোমিটার তৈরি হয়ে গিয়েছে, আর মাত্র ২০০ মিটার বাকি আছে। মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে ভালুক ছেড়ে দেব। আফ্রিকান সাফারির মতো এখানেও বন্য প্রাণীরা নিজেদের পরিবেশে থাকবে, আর মানুষ খাঁচার মতো গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াবে। আমাদের নির্দেশ আছে, ২০১৮ সালের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে, কিন্তু আমরা টার্গেট করে নিয়েছি ২০১৭-র মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করার। আর একটা সুখবর, শিলিগুড়ির মানুষ আমাকে বলেছিল এলিফ্যান্ট সাফারির কথা। হাতি এসে গিয়েছে। এবার

দেশের অন্যান্য জঙ্গল প্রসঙ্গে

আমার নিজে কোথাও ঘুরে দেখার সুযোগ এখনও হয়নি। সে সুযোগ হবে কি না জানি না। এত চাপ আমাদের, একদিকে সংগঠন দেখতে হয়, দলকে না দেখলে চলবে না। দপ্তরের একটার পর একটা প্রোগ্রাম থাকে। অন্যান্য অনুষ্ঠান থাকে। মাসে দুটো ক্যাবিনেট মিটিং। কলকাতা যাওয়া-আসা এখান থেকে, বুঝতেই পারছেন। উত্তরকন্যায় মাসে দু'দিন মিটিং। এই করেই তো সময় চলে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী যে দিনই আসবেন, তাঁর হাত দিয়ে এই সাফারি শুরু করাব। আমাদের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী।

আমি হোম টুরিজম অবধি বলতে পারব। ইকো টুরিজম তো আমি দেখি না, তাই এ ব্যাপারে কিছু বলা ঠিক হবে না। ওটা পর্যটন মন্ত্রী বলতে পারবেন।

প্রশ্ন- জঙ্গলে ওয়াইল্ডলাইফ সাফারির সুফল ও কুফল নিয়ে আপনার নিজস্ব অভিমত কী? সাফারি চালু থাকলে বন্য প্রাণ ডিস্টার্বড হয়, আবার সাফারি চালু না থাকলে চোরাশিকার বাড়তে পারে, কারণ নজরদারিতে জোর কমে যায়। আপনি কোনও মাঝামাঝি পথ বাতলাতে পারেন জঙ্গলপ্রেমী মানুষকে?

উত্তর- দেখুন, সাফারি দু'ধরনের হয়। এক, হাতির পিঠে চড়ে, আর-একটা গাড়ি করে। এর মধ্যে হাতির সাফারিতে পরিবেশে কোনওরকম সমস্যা হয় না, দূষণও হয় না। কিন্তু মোটরযানে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেখানে ধোঁয়া-শব্দ দুই-ই হয়। আমরা বেঙ্গল সাফারিতে বড় গাড়ি আনিয়েছি, যেখানে একসঙ্গে ২২ জন থাকতে পারবে। কিন্তু সব জঙ্গলে তো সেটা সম্ভব নয়। আবার নজরদারিও সমান জরুরি, নইলে চোরাশিকারের সম্যসা। সে ক্ষেত্রে বন্য প্রাণকে ডিস্টার্ব না করে কীভাবে সাফারি চালু রাখা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

ইকো টুরিজম প্রসঙ্গে

আমি হোম টুরিজম অবধি বলতে পারব। ইকো টুরিজম তো আমি দেখি না, তাই এ ব্যাপারে কিছু বলা ঠিক হবে না। ওটা পর্যটন মন্ত্রী বলতে পারবেন।

প্রশ্ন- মানুষ বনাম বন্য প্রাণ সংঘাত আজ ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছেছে— এই সংঘাত আরও ভয়ংকর হবে। কারণ, যত দিন যাবে, মানুষের সংখ্যা বাড়বে, আর তাদের বসবাসের জন্য জঙ্গল কমবে। আরও মানুষ মানেই আরও ভোট। পশুরা তো আর ভোট দিতে পারে না। অতএব জঙ্গল কমলে প্রতিবাদ করবার কেউ নেই। একদিন পশুপাখি সব পাশের রাজ্যে, পাশের দেশে পালিয়ে যাবে। ইতিহাসে এরকম উদাহরণ ভূরি ভূরি রয়েছে। তখন কি আর বন মন্ত্রী বা সান্ত্রি ইত্যাদির দরকার পড়বে? এখনকার বনকর্তারা ততদিনে অবসর নিয়ে নেবেন। তখন হাজার হাজার বনকর্মীর মাইনে আর জোগাড় করতে হবে না সরকারকে, বহু হাজার কোটি টাকা বেঁচে যাবে, মানুষের উপর করের বোঝা অনেক কমে যাবে। আর আজকাল যে পরিমাণ গাছ লাগানো হচ্ছে, তাতে সবুজের অভাব হবে না, ইকো ব্যালান্সও ঠিক থাকবে। অতএব জঙ্গলে বন্য প্রাণ না থাকলে মানুষের যে বিশাল কিছু ক্ষতি হবে, তার কোনও মানে নেই। এইটুকু শুনে আপনার খুব অযৌক্তিক মনে হচ্ছে কি? এটাই ভবিতব্য হবে— এই নিয়ে কোনও সংশয় বা বিতর্কের অবকাশ আছে কি? সরকারি বানানো কোনও বিবৃতি চাই না— যদি এ নিয়ে আপনার নিজস্ব কোনও ভাবনা থাকে, তবে তা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করুন।

উত্তর- মানুষ ও বন্য প্রাণের সংঘাত কমানোর জন্য আমরা অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়েছি। এদের সহাবস্থান কিন্তু জরুরি। বন্য প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যকে আমাদের রপ্ত করতে হবে। বন্য প্রাণ যদি কিছু বলেন, তা এখনও পুরুলিয়াতে আছে। সেখানে হাতি, ভালুক প্রচুর আছে। আদিবাসীদের সংখ্যাও অনেক। দেখবেন তো, ক'টা হাতির সঙ্গে ওখানে মানুষের সংঘাত হয়। সেখানে বন্য প্রাণীকে ওরা ডিস্টার্ব করে না। তারা জানে জঙ্গলের পরিবেশে কীভাবে সহাবস্থান করতে হয়। পাশে বাঁকুড়ায় কিন্তু সংঘাত বেশি হয়। আমাদের এখানে সংঘাত হবার কারণ, এখানে কোনও হাতি বা বাইসন এলে আমরা হইচই করি। এতে পশুরা ভয় পেয়ে যায়। তাদের চলার পথে আমরা বাধা সৃষ্টি করি। ফলে ওরা বিব্রত হয়। তখনই সংঘাত হয়। আমরা এই নিয়ে সচেতনতা বাড়াচ্ছি, নানা প্রোগ্রামে করছি, যাতে সংঘাত কমে। আমাদের জঙ্গলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাই সাত দিনব্যাপী আমরা যে বনমহোৎসব করি, তাতে প্রধান কাজই হল বৃক্ষ রোপণ করা। এ বছর আমরা আড়াই লক্ষ চারাগাছ বিলি ও রোপণ করেছি।

বনমন্ত্রীর একান্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন
'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিনিধি **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**
ছবি প্রতিবেদকের তোলা

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

সমস্যার সমাধানে বন্য প্রাণ বিভাগ আশাবাদী

‘এখন ডুয়ার্স’-এর মুখোমুখি **সুমিতা ঘটক**, আইএফএস, উত্তরের বন্য প্রাণ শাখার প্রধান

প্রশ্ন- রাজ্যের বন্য প্রাণসম্পদ ভীষণরকম অসুরক্ষিত— সুন্দরবন বা বাঁকুড়ার জঙ্গল কিংবা উত্তরের হিমালয় বা ডুয়ার্সের অরণ্য, কোথাও প্রতিকূল প্রকৃতি, আবার কোথাও চোরাশিকারি— ওয়াইল্ডলাইফ সর্বত্র বিপন্ন। অথচ আমাদের রাজ্যের জীববৈচিত্র দেশের মধ্যে একটা বড় স্থান নিয়ে আছে। আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন?

উত্তর- রাজ্যের বন্য প্রাণসম্পদ পুরোপুরি সুরক্ষিত নয়— এ কথা বেমালুম অস্বীকার করাটা বোধহয় সমীচীন হবে না। তবে ক্রুটিবিচ্যুতির পাশাপাশি নানারকম সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয় বন্য প্রাণ শাখার কর্মী ও আধিকারিকদের, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। তা সত্ত্বেও দেশের অনেক রাজ্যের থেকেই এ রাজ্যের ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন অনেক ভাল বলতে হবে।

প্রশ্ন- এই অসুরক্ষার পিছনে কারণ হিসেবে কর্মীবলের সমস্যার কথা আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। যথেষ্ট পরিমাণে ফিজিক্যালি ফিট এবং ওয়েল-ইকুইপড ফরেস্ট গার্ড থাকলে অসুরক্ষিত বন্য প্রাণকে অনেকটাই রক্ষা করা যেত— এটা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই, বিভিন্ন এনজিও-র বক্তব্যে কিন্তু তা স্পষ্ট। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর- ফরেস্ট গার্ডের সমস্যা আছে— এটা ঠিক, কিন্তু সে জন্য আমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসিডিয়োর চলছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বন সংলগ্ন এলাকার ছেলেদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, কারণ তারা জঙ্গলটা চেনে, বোঝে। উনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন। আশা করি শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে।

প্রশ্ন- ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেন্টারটিকে সক্রিয় করা যায় না?

উত্তর- সে কাজ আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি। সুকনায় আমাদের অফিস হচ্ছে। এই সেলটি অ্যাকটিভ হলে আশা করি কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে। তবে হ্যাঁ, আজ অ্যাকটিভ করব বললেই তো অ্যাকটিভ হয়ে যাবে না, তার কিছু প্রসেস আছে। স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন- ইকো টুরিজম যে ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছিল তা তো এখন আর থাকছে না। যে পাকা বিল্ডিংগুলো তৈরি হচ্ছে, তাতে তো বনসম্পদের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। আপনাদের কি কিছুই করার নেই?

উত্তর- যে ল্যান্ডের উপর এগুলো তৈরি হচ্ছে, সেখানে আমাদের নাক গলানোর কোনও অধিকার নেই। ওটা সম্পূর্ণই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের এক্তিয়ারভুক্ত। তবে হ্যাঁ, সকলে মিলে যদি ভাবা যেত যে, এতে বন্য প্রাণীদের কষ্ট হবে, অসুবিধে হবে তাহলে ভাল হত।

প্রশ্ন- বেআইনি গাছ কাটা ও চোরাচালান নিয়ে এর আগে বন দপ্তরের কড়া পদক্ষেপ বহু ক্ষেত্রেই যথেষ্ট কাজে দিয়েছে। অথচ চোরাশিকার নিয়ে দপ্তর এখনও কোনও সাফল্য পাচ্ছে না কেন?

উত্তর- চেষ্টা তো চলছেই। আমরা তো কেবল চেষ্টাটুকুই করতে পারি। সাফল্যের ব্যাপারটা আমাদের হাতে না থাকলেও আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।

সাক্ষাৎকার **শ্বেতা সরখেল**

শারদীয়ার অভিনন্দন

দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন এখানে কোনও রকম উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হয়নি। অনাস্থার মধ্যে দিয়ে মাত্র ৬ মাস হল এই পঞ্চায়েত সমিতির হাত বদল হয়েছে। শুরু হয়েছে উন্নয়নের কাজ, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৬/৭টা ব্রিজের কাজ, মৎস্যজীবিদের জন্য গীতাঞ্জলি প্রকল্প, মাছ ধরার জন্য নানা উপকরণ— জাল, হাঁড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিস দেওয়া হচ্ছে। কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে যন্ত্রপাতি, হাল, ট্রাক্টর দেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন শুরু হয়েছে। বাণেশ্বর থেকে বীরপাড়া হেরিটেজ রোড হচ্ছে। ২ নং ব্লকে কালজানি নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। মরিচবাড়িতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। এবার পুজোয় গরীব মানুষদের জামাকাপড় আর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নারকোলের চারা বিতরণ করার ইচ্ছেও আছে কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতির।

আগামী উৎসবের মরশুম সবার আনন্দে কাটুক, সেই শুভেচ্ছা রইল।

জজ লেপচা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতি, পুন্ডিবাড়ি

শ্রীমতী শিখা দাস
সভাপতি
নূর ইসলাম
সহকারী সভাপতি
কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতি, পুন্ডিবাড়ি

কোচবিহার ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
পুন্ডিবাড়ি

বনরক্ষায় প্রয়োজন ফৌজি কায়দায় অপারেশন

বনরক্ষায় তথা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে দেশের সর্বত্রই বনরক্ষী বাহিনীকে সহায়তার জন্য লিপ্ত থাকে নানা মাপের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ডুয়ার্সের জঙ্গলেও তার ব্যতিক্রম নেই। বনরক্ষায় কতটা সোচ্চার এইসব সংস্থাগুলি? চোরাশিকারের সমস্যা সমাধানে কতটা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা? নাকি নিরাপদ দূরত্বে থেকে সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ তাদের কর্মসূচি? এবারের বিষয় সেসবের তদন্ত না হলেও বন্যপ্রাণ রক্ষার রীতিনীতি নিয়ে তাঁরা কী বলছেন সেটা অন্তত জেনে নেওয়া যাক। আমাদের প্রতিনিধি নাগাল পেলেন এরকমই দুই সংস্থার মুখপাত্রের।

'এখন ডুয়ার্স'-এর মুখোমুখি **সূর্যকমল বণিক** স্নেহা (সোসাইটি ফর নেচার এডুকেশন অ্যান্ড হেল্‌থ অ্যাওয়ারনেস)

প্রশ্ন- আপনার সংস্থা বন্য প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য নানান কাজকর্ম করে থাকে আমরা জানি। কী ধরনের কাজ আপনারা করেন?

উত্তর- আমাদের মূল কাজটাই সচেতনতা সংক্রান্ত। বন লাগোয়া যেসব গ্রাম আছে, সেখানকার মানুষের সহযোগিতা না পেলে অবৈধ বৃক্ষনিধন কিংবা চোরাশিকার কোনওটাই আটকানো সম্ভব নয়। আমরা তাই ওদের কাছে পৌঁছে ওদের মধ্যে বনসুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। ফলে বিভিন্ন বনবস্তিতে গিয়ে আমরা নানান বিষয়ের উপর আমাদেরই তৈরি করা তথ্যচিত্র দেখাই, আলোচনাসভার আয়োজন করি, সেমিনার, কুইজ— এসবও হয়। এখন আমরা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ ওরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

প্রশ্ন- আপনার কি মনে হয় যে শুধুমাত্র সচেতনতার মাধ্যমেই চোরাশিকার বন্ধ করা যাবে?

উত্তর- না, কখনওই না। পুরোটা কখনওই সম্ভব নয়। কারণ, এসবের পরও দরিদ্র গ্রামবাসীকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অনায়াসে পোচিং চলছে।

প্রশ্ন- তাহলে কি এটা সরকারের চরম ব্যর্থতার জায়গা নয়?

উত্তর- একশো শতাংশ। বন্য প্রাণ রক্ষা করার জন্য গ্রাসরুট লেভেলে কোনও ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। অল্প কয়েকটি হাতে গোনা ক্যাজুয়াল কিংবা কন্ট্রাকচুয়াল বনকর্মী আছে, যাদের রিভলভার দেখালেই তারা আর এগবে না, কারণ তারা নিজেরা ওয়েল-ইকুইপড নয়। এত বিশাল ফরেস্ট এরিয়া সামলানোর জন্য সরকারের ইমিডিয়েট পার্মানেন্ট লোক নিয়োগ করা উচিত, যারা শুধুমাত্র বনই পাহারা দেবে। শুধু তা-ই নয়, যথেষ্ট ট্রেনিং এবং উপযুক্ত অস্ত্র তুলে দিতে হবে তাদের হাতে। দেশের সীমান্তসুরক্ষায় বা জঙ্গি দমনে যেভাবে আপৎকালীন ফোর্স নিয়োগ বা অপারেশন হয়, তেমনভাবেই চোরাশিকারিদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে জঙ্গলকে। পরিস্থিতি আজ এমন পর্যায়েই পৌঁছেছে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে বন্য প্রাণের ব্যাপারে আমাদের দেশের এবং রাজ্যের সরকার যথেষ্ট উদাসীন। কাজ করতে গিয়ে এমনও দেখেছি, দপ্তরের বড় অফিসার হওয়া সত্ত্বেও বন্য প্রাণীদের প্রতি তাঁদের আবেগ অত্যন্ত কম। খুবই দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা। এই মনোভাবও পালটানো দরকার।

প্রশ্ন- ইকো টুরিজম এবং ওয়াইল্ডলাইফ কনজার্ভেশন কোথাও কি ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে?

উত্তর- এখানে একটা কথা বলার আছে। ইকো টুরিজম যেভাবে শুরু করা হয়েছিল, সেটা ছিল যথেষ্ট ভাল কনসেপ্ট। বন দপ্তর এবং গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে টুরিজম ডেভেলপমেন্টের কাজ সুন্দরভাবে শুরু হয়েছিল। তাতে সরকারের কিছু রিসর্টও সেখানে তৈরি হয়েছিল, যেখানে বন সংলগ্ন গ্রামবাসীরা বিভিন্ন কাজে লাগতে পারত। ফলে সেইসব ইকো ভিলেজে পর্যটকরা থাকতে এলে সব দিক ঠিকঠাক বজায় রেখেও বিনোদন দেওয়া যেত। কিন্তু এখন যেভাবে ফরেস্টের গা ঘেঁষে বেসরকারি রিসর্টগুলো গজিয়ে উঠছে, যেখানে নিয়ম হল, ফরেস্ট এলাকার ১০ কিমির মধ্যে এই জাতীয় কোনও বিল্ডিং তৈরি করা যাবে না, তাতে তো আমরা আতঙ্কিত। কোথা থেকে এরা অনুমতি পাচ্ছে কে জানে! মূল কথা হল, বন্য প্রাণী এবং ফরেস্টের ইকো সিস্টেম নিয়ে সরকার যদি কিছু না ভাবে তাহলে আমরা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হব খুব অল্প সময়ের মধ্যেই।

বড় কোনও সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা

'এখন ডুয়ার্স'-এর মুখোমুখি **অনিমেষ বসু** ন্যাফ (হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন)

প্রশ্ন- আপনার সংস্থা তো পরিবেশ নিয়েই বিভিন্ন কাজকর্ম করে। বন্য প্রাণ নিয়ে আপনারা কী কী কাজ করেন?

উত্তর- বন্য প্রাণ নিয়ে কাজ বলতে বনের মধ্যে যাতে সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে, মানুষের সঙ্গে বন্য প্রাণের যাতে সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ রেখে মূলত সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয়। এদিকে লক্ষ রেখে আমরা ফিল্ম বানাই, পথনাটক করি, কুইজ, আলোচনাসভা— এসবের আয়োজন করি। এসব ছাড়াও বন্য প্রাণ সেনসাসের সময় আমরা সরকারের সহযোগিতা করি, বিভিন্ন রিসার্চ ওয়ার্কও হয়। এর ফলে বন সংলগ্ন মানুষ যাতে বন্য প্রাণ রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। তারা যদি অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয় তাহলে বাইরে থেকে কেউ কিছু করতে পারবে না।

প্রশ্ন- চোরাশিকার বন্ধ করার জন্য এটুকুই কি যথেষ্ট?

উত্তর- একেবারেই না। পোচিং বন্ধ করতে হলে প্রধানত দরকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং আধুনিক অস্ত্রসহ বনকর্মী, যারা রীতিমতো জঙ্গল পাহারা দেবে। বন দপ্তরের কাজে যে গুটিকতক ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দাররা আছে, তাদের পক্ষে এত বড় দায়িত্ব সামলানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন- তাহলে বন্য প্রাণকে রক্ষা করতে না-পারা এবং বন দপ্তরকে ঠিকঠাক না সাজাতে পারাটাও কি সরকারের চরম ব্যর্থতা কিংবা চূড়ান্ত ঔদাসীন্য নয়?

উত্তর- এক্কেবারেই তা-ই। সরকার এদিকে কোনও দৃষ্টিপাত করছে না। তা না হলে দিনকে দিন পোচিং এত বাড়ছে কী করে? কিছুটা আমাদের কানে আসে, অনেক কিছুই আমরা জানতে পারি না।

প্রশ্ন- এনজিও-গুলোর কি কিছুই করার নেই?

উত্তর- এনজিও-র তো অত ম্যানপাওয়ার নেই যে সেখানে গিয়ে পাহারা দেবে। তবে এনজিও অবশ্যই চাপ দিতে পারে। আমরা সরকারের ঊর্ধ্বতন পদাধিকারীদের চিঠি দিয়েছি, রেলে কাটা পড়ে হাতির মৃত্যুর পর আমরা ধরনায় বসেছি, পোচিং বন্ধ করার ব্যাপারে বারে বারে আলোচনা করেছি, কিন্তু এর পর তো বাকিটা সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। এখানে তিনটি আরও প্রয়োজনীয় পথের কথা বলা দরকার। প্রথমত, আলাদা আলাদা এনজিও, যারা বন্য প্রাণ নিয়ে কাজ করছে, তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় দরকার। সবাই মিলে একত্রিত হতে আমাদের বক্তব্য, সরকারের বক্তব্য— সবটাই লেখার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানো দরকার, শুধু তা-ই নয়, সরকারের কাছেও। আপনারা ভাল উদ্যোগ নিয়েছেন। তৃতীয়ত এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল 'ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল সেল'টিকে অ্যাকটিভ করতে হবে। বন দপ্তরের পাশাপাশি একটি সেল তৈরি করা হয়েছিল, বেশ অনেকদিন হয়ে গেল। সেই সেলটিকে পুলিশ, বিএসএফ, এসএসবি, কাস্টমস প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের কাজে লাগানো হয়েছিল। সকলের সহযোগিতায় একটি এমন সেল, যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু কার্যকারিতা নেই। এই সেলটিকে ঘুম থেকে তুললে কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার মনে হয়।

প্রশ্ন- ইকো টুরিজম এবং বন্য প্রাণ সংরক্ষণ কোথাও কি দুটো ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে না?

উত্তর- ইকো টুরিজম এবং বন্য প্রাণ সংরক্ষণ কোথাও কি দুটো ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে না? উত্তর- ইকো টুরিজম অত্যন্ত সঠিক একটি ভাবনা, কিন্তু তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেটি আর সঠিক থাকছে না। ফরেস্টকে বাঁচিয়ে, পরিবেশকে ঠিক রেখে যদি করা যায় তাহলে ভাল। এখন হোমস্টে নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছে, সেটাও ভাল কনসেপ্ট, তবে এখানেও ওই একই কথা বলার যে, মানুষকে সচেতন হতে হবে। সব মিলিয়ে একটাই কথা বলা যায় যে, অরণ্য যে অবস্থার দিকে গড়াচ্ছে, তাতে বড় কোনও সামাজিক বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে খুব শীঘ্রই।

এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব

অগাস্ট ১, ২০১৬ থেকে চালু হয়ে গেল 'এখন ডুয়ার্স ক্যামেরা ক্লাব'। ডুয়ার্সের প্রকৃতি, মানুষ, বন্যপ্রাণ ও নানাবিধ ঘটনাকে ফ্রেমে বন্দি করার সংঘবদ্ধ প্রয়াস। ছবি তোলা যাদের নেশা তারা যে কেউ এই ক্লাবের সদস্য হতে পারেন।

- এক বছরের সদস্য চাঁদা ৫০০ টাকা।
- সদস্যদের সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়া হবে।
- সদস্যরা তাঁদের বাছাই করা ছবি নিয়মিত পাঠাতে পারবেন অন লাইন-এ।
- মাসে একবার আড্ডাঘরে সদস্যদের বৈঠক বসতে পারে। সেখানে বাছাই করা ছবি দেখা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে।
- ত্রৈমাসিক ওয়ার্কশপ- ফটোওয়াক হবে অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের তত্ত্বাবধানে।
- বাছাই ছবি নিয়ে কলকাতায় ও জলপাইগুড়িতে বছরে দু'বার চিত্র প্রদর্শনী হবে।
- নির্বাচিত ছবি 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ছবি প্রতি সম্মান দক্ষিণা পাবেন চিত্রগ্রাহক। বছরে দু'বার এই দক্ষিণা সাকুল্যে দেওয়া হবে।
- পাঠানো ছবি ফেসবুক বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না।
- সদস্য হতে গেলে চেক পাঠাতে হবে Ekhon Duars নামে।
- আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগঃ আড্ডাঘর। মুক্তাভবন। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি। মেল dooarscameraclub @outlook.com

গালভরা নাম 'টি টুরিজম' কিন্তু অন্য টুরিজমের সাথে তফাৎ কোথায় ?

জ্ঞানের সীমা আছে আর অজ্ঞানতা সীমাহীন— এই আপ্তবাক্যের সশরীরি প্রকাশ নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে বোমকে গেলাম। ডুয়ার্সে জন্মে আর তারপর এই প্রায় পঞ্চাশ বছর নিরবিচ্ছিন্ন ডুয়ার্সে বাস করেও আমি জুরান্তি টি ট্যুরিজমের বাংলো খুঁজে পাচ্ছি না! এবারের সংক্ষিপ্ত সফরে পারিবারিক এক আনন্দ অনুষ্ঠানে সবাই এক রাত কাটাব জুরান্তিতে। এর নাম শুনেছি বেশ কিছুদিন যাবৎ। সঙ্গে শ্বশুর, শাশুড়ি, বড় শ্যালিকা দু'জন, এক বড় ভায়রা, শ্যালিকা, আর আমার আর দুই বড় শ্যালিকার দুই পুত্র। শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছে ডুয়ার্সের এই স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞের প্রেস্টিজে, কী যেন বলে— গ্যামাক্সিন। শিলিগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে সেভকে এসে সামান্য জলযোগ সেরে প্রথম দাঁড়ালাম সেভক ব্রিজে। এখানটায় এতবার দাঁড়াই কিন্তু এর সৌন্দর্য আর পুরনো হয় না। এর একদিকে তিস্তার একরকম সৌন্দর্য— সেখানে সে বন্য, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পাহাড় বিদীর্ণ করে সে ছুটে আসছে। কল হাস্যময়ী চঞ্চল কিশোরী তিস্তা। আর সেই সেতু পেরিয়েই তার গতির ছন্দ গেছে পাল্টে, সে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। গতি হয়ত কমেছে, কিন্তু এখানে সমভূমিতে পৌঁছে সে পূর্ণ যৌবনা। নারীর মতো ধীর, যত দূরে তাকাও খালি তিস্তা। ধোঁয়া ধোঁয়া বাষ্প মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আর দূরে অরণ্যের নিশ্চিত আভাস। নদীর গর্জ বেয়ে ছুটে আসা দামাল বাতাস। আর চারদিক ঘেরা সবুজ পাহাড়। সঙ্গে মানুষের তৈরি অনিন্দ্য সুন্দর এই সেতু। সব মিলিয়ে সেভক কখনও পুরনো হয় না। তবে কাছেই মন্দিরের (পাহাড়ের চূড়ার একটি মন্দির না থাকলে আর ভারতবর্ষ কীসে?) ভীড় আর সিকিমের জীবনরেখা জাতীয় সড়কে অসভ্য জ্যামজট সেভকের নির্জনতা বিনষ্ট করেছে। আর এখন চঞ্চল কিশোরী তিস্তার পায়ে মানুষ পরিয়েছে শৃঙ্খলার বেড়ি। একের পর এক বাঁধ উচিয়ে উঠেছে তিস্তার বুকে। শুধু আমাদের তিস্তা হারিয়েছে তার নিজের অনুপম ছন্দ। এখন সে মানুষের ইঙ্গিতে নাচে। কখনও সে একেবারে শীর্ণ— কেননা বাঁধ আটকে দিয়েছে, আবার কখনও বাঁধ থেকে ছাড়া পাওয়া জল তীব্র আক্রোশে ভীম বেগে নিচে আসে। কতদিন আর বাঁচবে আমাদের এই তিস্তা? (বিদ্যুৎ,আরও বিদ্যুৎ চাই এই সভ্যতার চাকা ঘোরাতে। এই বিদ্যুৎ চলে যাবে সেই দূরে দিল্লিতে, মুম্বইতে, দেশ এগিয়ে যাবে।)

এই হল ডুয়ার্সের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে আমার সমস্যা। বলছিলাম নিজের

> গাড়ি পার্ক করে নেমে বাংলোটি দেখেই ভাল লেগে যায়। সুন্দর বাংলোটি। ইউরোপিয়ান স্থাপত্য একেবারে স্পষ্ট। সামনে বিরাট বারান্দা। তাতে অনেক সোফা সাজানো। বেতের রিক্লাইনার। তারপর বাংলোর ভিতরে একটি স্যুইট আর দুটি ঘর। ঘরগুলো দেখেই আমাদের মন ভালো হয়ে গেল।

অজ্ঞানতার কথা, ঢুকে পড়ল তিস্তা। যাই হোক, সেভকের সেতু পেরিয়ে মংপং, ওদলাবাড়ি, লিস, ঘিস, চেল নদী পেরিয়ে মালবাজার। টুকিটাকি জিনিস কিনে, গাড়িতে জ্বালানি ভরে চালসা। চালসা গোলাই থেকে কাঁধে পাহাড় উজিয়ে যাত্রা। অল্পই উঁচু কিন্তু পাহাড়ের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। ১৩ কিমি উঠেই একজায়গার বাঁকের মুখে দাঁড়াই। এটা আমার আরেকটি প্রিয় বিরাম। নিচে চালসার ছোট্ট জনপদ। তারপর গোরুমারা অরণ্যের বিস্তার আর মূর্তি, কুর্তি, ন্যাওড়া দূরে রুপোলি রেখার মতো দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

এবার মেটেলি। বাজার থেকে বাঁয়ে জুরান্তি। আর রাস্তা মানে রাস্তার মতো কিছু। তাতে নানা ছোট-বড় (বড়ই বেশি) খাদ, চড়াই-উৎরাই। পাহাড়ের রাস্তায় তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। চলাই দায়। আমাদের সব গাড়িই নীচু। ফলে এই প্রায় ছয়-সাত কিমি পথ পেরোতে প্রাণ যায়। কিন্তু ট্যুরিজমের বাংলোটির কোনও হদিশ করতে পারছি না। এদিকে আমার আবার একটি সমস্যা আছে। ডুয়ার্সের যে কোনও লোক বাংলা, হিন্দি, রাজবংশী, সাদ্রী, নেপালি আরও নানা ভাষা জানে। কিন্তু আমি যেখানে বড় হয়েছি সেই কুমারগ্রামে রাজবংশী ভাষাই হল আমাদের লিংগুয়া ফ্রাংকা। আমরাও রাজবংশী বলতাম। আদিবাসীরাও তাই। ফলে আদিবাসীদের সাদ্রী ভাষাটিতে আমি ততটা সড়গড় নই। বুঝতে কিছুটা পারি কিন্তু বলতে পারি না। নেপালিও তথৈবচ। এবার জুরান্তির বাংলো খুঁজতে গিয়ে ভাষা বিভ্রাটে ম্যানেজারের বাংলোয় গিয়ে উপস্থিত। তারপর জানলাম, না ম্যানেজার নয়, ডিরেক্টরদের বাংলোটিকেই টি ট্যুরিজমের কাজে লাগানো হচ্ছে। ভাষা এবং পথ এই দুই বিষয়ে নিজের সীমাহীন অজ্ঞানতা

আবিষ্কার করে শেষ অবধি জুরান্তি বাংলোর সঠিক হদিস পাওয়া গেল।

দের আয়া লেকিন দুরস্ত আয়া। শেষ রাস্তাটি ভাল আর চা-বাগানের বুক চিরে নির্জন ছোট পাহাড়ের একেবারে চূড়োয় বাংলোটি। ফলে ওঠবার রাস্তার সৌন্দর্য অনবদ্য। পাহাড়ের মাথায় একটা চওড়া সমতল। গাড়ি পার্ক করে নেমে বাংলোটি দেখেই ভাল লেগে যায়। সুন্দর বাংলোটি। ইউরোপিয়ান স্থাপত্য একেবারে স্পষ্ট। সামনে বিরাট বারান্দা। তাতে অনেক সোফা সাজানো। বেতের রিক্লাইনার। তারপর বাংলোর ভিতরে একটি স্যুইট আর দুটি ঘর। ঘরগুলো দেখেই আমাদের মন ভালো হয়ে গেল। যেমন বড় ঘর তেমনি বড় খাটগুলো। প্রতি ঘরে একাধিক সোফা, একাধিক খাট। তার পর্দা, বেড কভার, সোফার সব রং মিলিয়ে ঘরগুলো সত্যি সুন্দর। বিরাট ডাইনিং হল। বসবার বিরাট ঘর। বিলিয়ার্ডস রুম। একটি বড় পিয়ানোর বাক্স। এখন তাতে পিয়ানো নেই। প্রতি ঘরে ফায়ারপ্লেস। একটি লাইব্রেরিও ছিল। সেটিতে যত্নের অভাব। কিন্তু কিছু বই টিকে আছে। সবমিলিয়ে কলোনিয়াল ফ্লেভার। সব ঘর জুড়ে বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা গেল। এসে গেল গরম কফি। জানুয়ারির ডুয়ার্সে আর পাহাড়ের চূড়ায় শন শন বাতাসে দুপুরেই গায়ে বিঁধে যাওয়ার শীত। তাই এই কফিটি দরকার ছিল।

কফির মগ হাতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে ঝলমলে কাঁচা রোদ। বাঁয়ে একটি বড় মাঠ, সেখানে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট। হাঁটতে হাঁটতে ওপারে গিয়ে এক আবিষ্কার। একটা কামরাঙা গাছ। ফলে ফলে হলুদ হয়ে আছে। নীচে অজস্র পাকা কামরাঙা পড়ে আছে। কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল কেউ খায় না, আমরা যত খুশি নিতে পারি। ব্যাস শুরু হয়ে গেল কামরাঙা পাড়বার ধুম। কামরাঙা আর কত খাওয়া যায়? কুড়ানো

ওদলাবাড়ি থেকে শুরু করে নিউ ল্যান্ডস অবধি এত যে চা বাগান তার প্রত্যেকটির অবস্থান অনবদ্য। অনেকগুলি বাগান সার্ভে করে বেছে নিলে একটি বা একাধিক বড় রিসর্ট চেইন পালটে দিতে পারে না চা বাগানের ধ্বস্ত চেহারা? কিন্তু বাগানের রাস্তা, জল, বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

আর পাড়াতেই আনন্দ। বাংলোর কর্মচারীরা এক লহমায় আমাদের বুঝে গেলেন যে আদেখলা একদল গেস্ট এসেছে।

খোলা মাঠে দুটো পার্টি বড়দের আর ছোট তিনটে বিলিয়ার্ডের টেবিলে ব্যস্ত। ভূমিকার উল্টোপুরাণ। বড়রা ছোটর ভূমিকায় আর ছোটরা বড়র। তবে মধুমেহ আর মেদে আক্রান্ত বড়রা আর কতক্ষণ ছোটাছুটি করবে! অচিরেই উৎসাহের পরিসমাপ্তি। গরম জলে স্নান সেরে বসবার ঘরে সেই গ্যাট হয়ে বসলাম সব। নরক একবারে গুলজার। হাসি, ঠাট্টা, আড্ডায় কেটে গেল সময়টা। এমন সময় দ্বিপ্রাহরিক আহারের ডাক। আয়োজন মন্দ নয়। তবে বাচ্চাগুলো (বাচ্চা আর বলা যায় কি?) ভালই খেল। আর চনচনে খিদের মুখে আমরাও টানলাম তা মন্দ না।

দুপুরে বাইরে বারান্দায় পিঠে রোদ দিয়ে বই নিয়ে বসলাম। ভিতরে বেশিরভাগই শয্যা নিয়েছেন আর বোনেরা হাহাহিহিতে নিমগ্ন। বিকেলের মরে আসা রোদ। আর নির্জনতা পাখির ডাকে ভরে যাচ্ছে। দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘন বনানীর সীমারেখা, সামনে নীচে চা-বাগানের ঢেউ খেলানো সবুজ কার্পেট আর ছোট হয়ে আসা মানুষজনের চলাফেরা। অন্যদিকে, পাহাড়ের পর পাহাড়— পাহাড়ের সমুদ্র। বই পড়ব না চুপ করে বসে রইব।

আমাদের শ্বশুর মহাশয় আর শ্বশুরমাতার সেদিন ছিল বিবাহের অর্ধশতাব্দী। তাঁরা কিছুই জানতেন না। তাঁদের চার কন্যা ষড়যন্ত্র করে এই আয়োজন করেছিলেন। বিকেলে কনে দেখা আলোয় তাঁদের বিবাহের পঞ্চাশ বছর পরে মাঠের মধ্যে একটি আবেগঘন ছোট উৎসব উদ্‌যাপন হল। পঞ্চাশ বছর? আমরা বয়স পঞ্চাশ পার করতে তখন কয়েক বছর বাকি তাতেই হিমশিম। আর বিয়ের পঞ্চাশ বছর? যাস্ট ভাবা যায় না। ফোটোসেশন বেশ জমেছিল। মেয়ে জামাই, নাতিদের নিয়ে বুড়ো-বুড়ির অনুষ্ঠানটি জমে গিয়েছিল।

বিকেল একটু পড়তে না পড়তেই ঠান্ডা পড়ল জাঁকিয়ে আর তার সাথে শনশন হাওয়া। হাওয়া আর শীতের দাপটে বাইরে বসা গেল না দীর্ঘক্ষণ। সবাই ঢুকে পড়ল ঘরে। চা, পকোড়া ইত্যাদি প্রচুর ধ্বংস করা গেল। আমার মনে হচ্ছিল এই বসবার ঘরে একসময় শেরির গ্লাস হাতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মালিকরা আর চারদিকে গাউন পরা মেমসাহেবরা পিয়ানোতে টুংটাং সুর তুলেছে। খিদমদগারে ব্যস্ত নেটিভরা। আজ তারা কোথায়? তারপর দেশ স্বাধীন হলে কালো চামড়ার সাহেবরা একই প্রথা একইভাবে চালিয়ে গিয়েছে। চা-বাগানগুলো আজ ধুঁকছে। আজ কোথায় সেই জাঁকজমক আর আড়ম্বর? ইংরেজ তাড়িয়ে দেশীয় মালিক হয়েছে, চা বাগানের শ্রমিকরা আজও একই অবস্থায়। শুধু সাংগঠনিক দক্ষতার অভাবে আমরা চা বাগানগুলো ধ্বংস করে ফেলেছি। তাই বোধহয় আজ জুরান্তি বাংলোয় ভূতের ভয়। সাহেবের প্রেতরা বোধহয় এই অনুপম পরিবেশের মায়া ছেড়ে বেরতে পারেনি। বিদ্যুতের আলোয় অবশ্য ভূতেরা জব্দ। তাদের দেখা যদিও মেলে না। তবে তেনারা নাকি আছেন।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ওপরে ঝকঝক করছে তারারা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছায়াপথ। কত কত আলোকবর্ষ দূরে কোথাও কি এমন কোনও গ্রহ নেই যেখানে বুদ্ধিমান প্রাণীরা আছে। নানা চিন্তা ভিড় করে আসে। দূরে কুলিবস্তির (হ্যাঁ আজও চা বাগানে কুলি বস্তি বলা হয়। মুলকরাজ আনন্দের থেকে চা বাগান খুব একটা এগতে পারেনি) থেকে ভেসে আসে মাদলের শব্দ। রাত একটু বাড়লে নিস্তব্ধ হয়ে যায় চরাচর। আমাদের দেশে বিশেষ করে এই বাংলায় যেখানে বর্গকিমি হিসেবে জনসংখ্যা দেশে সবচেয়ে বেশি সেই বাংলায় নির্জনতা খুবই বিরল। যেদিকে থাকাও সেই দিকে খালি মানুষ, দারিদ্র, দলাদলি, নোংরা রাজনীতি। আজ এই নির্জন জুরান্তির পাহাড়ের চূড়ায় বসে মনে হচ্ছিল বুঝিবা সময় পিছিয়ে গিয়েছে কয়েক শতক বা কয়েক সহস্র বছর। এমন ঘন নির্জনতা যেন ছুরি দিয়ে কাটা যাবে। চুপ করে বারান্দায় বসে থাকতে ভারী ভালো লাগে।

কিন্তু ঠান্ডায় বেশিক্ষণ বসতে দেয় না। ঘরে ঢুকি। এরই মধ্যে ডিনার তৈরি। ঘড়িতে সাড়ে আটটা। কী করা যাবে কর্মীরা সব ঘরে যাবে। ফলে সাহেবি বাংলোয় সাহেবি কেতায় সাহেবি সময়ে ডিনার। মেনু যদিও নিখাদ বাংলা।

যদি আমাদের মতন অবসরকামী টুরিস্ট না হয়ে কোন টুরিস্ট কলকাতা থেকে বা অন্য কোথা থেকে আসেন তবে কিছু সমস্যা আছে। তিনি দুটো দিন করবেন কী? যদিও গালভরা নাম 'টি টুরিজম' কিন্তু ডুয়ার্সের অন্য টুরিজমের সাথে তফাৎ কোথায়? সরকার বহুদিন ধরেই টি টুরিজম করতে চাইছেন কিন্তু তার নির্দিষ্ট রূপরেখা কি? কোথায় গিয়ে সে আলাদা হবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে। ওদলাবাড়ি থেকে শুরু করে নিউ ল্যান্ডস অবধি এত যে চা বাগান তার প্রত্যেকটির অবস্থান অনবদ্য। পাহাড়, নদী, চা বাগান (অবশ্যই) মিলে প্রত্যেকটি বাগানই অনিন্দ্য সুন্দর। এগুলোকে একছাতার তলায় আনা যায় কি? একটু অর্থবান টুরিস্টের সেরা ডেস্টিনেশন হতে পারে চা বাগানের বাংলোগুলি। জমি সংক্রান্ত জটিলতা একটি বড় সমস্যা। জুরান্তি বা ফাগু বা ফাসখাওয়ার মতো একটি দুটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ সফল হতে পারে কিন্তু একটি আলাদা সার্কিট হিসেবে জনপ্রিয়তা পেতে গেলে আর্থিক উদ্যোগ দরকার। এটা যে সম্ভব গ্লেনবার্ণ-তাকদা-চিয়াবাড়ি তার প্রমাণ। অনেকগুলি বাগান সার্ভে করে বেছে নিলে একটি বা একাধিক বড় রিসর্ট চেইন পালটে দিতে পারে না চা বাগানের ধ্বস্ত চেহারা? কিন্তু বাগানের রাস্তা, জল, বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। আজও ডুয়ার্সের নানা অঞ্চলে জলের ভয়াবহ সমস্যা, বিদ্যুৎ একবার গেলে তার দেখা মেলা ভার। এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। মন্ত্রীমহাশয়রা চেষ্টা করছেন। কিন্তু মন্ত্রীর চিন্তা আর গতির সাথে বাকি প্রশাসন তাল মেলাতে পারছে কি? প্রকৃত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে কি? নতুবা সদিচ্ছা দিয়ে বেশি এগনো দুষ্কর হবে। আমাদের চা বাগানগুলো ভিন রাজ্যের এবং বিদেশি পর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠতে প্রস্তুত। আমাদের তো কয়েকশ বছরের পুরানো কেল্লা নেই রাজস্থানের মতো। এই কলোনিয়াল বাংলোগুলো কিন্তু তার জায়গা নিতে পারে।

এইসব এলোমেলো চিন্তা ভিড় করে আসে মাথায়। সবাই ঘুমে মগ্ন। ঘড়িতে মাত্র ১০টা। এটাতো শহরে সান্ধ্য আড্ডায় চা খাবার সময়। আর এখানে? চারদিক ঘুমে অচেতন। তেনারাও এলেন না। অতএব বিছানায় যেতেই হয়।

খুব সকালে উঠে হেঁটে এলাম খানিকটা। চারদিকে সোনা রোদে ঝলমল করছে। আরেকটা নতুন দিন। জলখাবার খেয়ে চালসা, সেখানে মূর্তিতে দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে বিকেল বিকেল যার যার খাঁচায় এসে ঢোকা। দীর্ঘদিন মনে থেকে যাবে গতকালের দিনটি, বিশেষ করে রাতটি।

তাপস বরণ চন্দ

অনবদ্য এক রেল মিউজিয়াম এখনও পর্যটনপ্রেমীদের অজানা

কোচবিহার শহরের মাঝে কোচবিহার রেল স্টেশন। পাশ দিয়ে চলে গেলে বোঝারই উপায় নেই যে স্টেশনের পাশেই রয়েছে এত সুন্দর একটি রেল মিউজিয়াম। এ বছর মার্চ মাসে সাধারণ দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হলেও বাইরের পর্যটক কেন, খোদ কোচবিহারের বেশির ভাগ মানুষই এখনও জানেন না এই মিউজিয়ামের কথা। কোচবিহার রেল স্টেশনের ডান দিকে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এই মিউজিয়ামটি। বাইরে থেকে এক ঝলক দেখলেই এর দুধসাদা ভবনের সৌন্দর্য আপনার চোখ টানতে বাধ্য। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির আদলে তৈরি এই রেল মিউজিয়াম বাইরের থেকে যেমন মনোমুগ্ধকর, ভিতরেও তেমনই একই রকম আকর্ষণীয়।

কোচবিহার রেল মিউজিয়ামে সাতটি ঘরে মোট পাঁচটি গ্যালারি রয়েছে। বিভিন্ন শীর্ষনামে এই গ্যালারিগুলোতে রেলওয়ের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ডের নানান দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন— ১) রেলওয়েজ নাও অ্যান্ড দেন ২) ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা, ল্যান্ডস্কেপ ৩) রেলওয়েজ হোয়াট হ্যাপেনড অ্যান্ড হোয়েন, আ হিস্টরিক্যাল পার্সপেকটিভ ৪) লোকোমোটিভ, ৫) রেলওয়েজ অ্যান্ড ইটস মেডিক্যাল সার্ভিস। এ ছাড়াও রয়েছে একটি অডিও-ভিশুয়াল দেখানোর ঘর। এই ঘরে রেলের ইতিহাস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হয়। আর রয়েছে একটি ছোট্ট লাইব্রেরি, যা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের পক্ষে খুবই উপযোগী। এখানে টিকিটের মূল্য বড়দের ২০ টাকা এবং ১২ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের ১০ টাকা করে।

রেলের সঙ্গে কোচবিহারের সম্পর্ক বহু পুরনো। তখন কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলা নয়, রীতিমতো আলাদা রাজ্য— কোচবিহার স্টেট। কিন্তু ভারতের এই প্রান্তিক রাজ্যে সে সময় যোগাযোগব্যবস্থা ছিল বড্ড দুর্বল। পরবর্তীতে যোগাযোগের উন্নতির জন্য কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ নিজস্ব রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। ওই সংস্থার নাম ছিল কোচবিহার স্টেট রেলওয়েজ (সিবিএসআর)। ১৮৯৪ সালের ১ মার্চ ন্যারোগেজ লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। রেলের ইতিহাসের সূচনা হয় এক নতুন অধ্যায়ের। এর পর এই রেলপথ বদলে যায় মিটারগেজে। আর কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে বদলে যায় ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েতে। এ ধরনের নানান ঐতিহাসিক বিবর্তনের তথ্য ও নিদর্শন রয়েছে এই রেল মিউজিয়ামে। রয়েছে রাজ-আমলের সেই ন্যারোগেজ রেললাইনের একটি ছোট অংশ। ১৮৯২ সালে বানানো ২ ফুট ৬ ইঞ্চির ন্যারোগেজ রেললাইন, যা দেখে সত্যিই অবাক না হয়ে পারা যায় না।

মিউজিয়ামের চারদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বহু পুরনো সব জিনিস, যা থেকে ভারতের রেলের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সুন্দর করে বোঝা যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে সে দিনের রেল আজকের আধুনিক রেলে পরিণত হয়েছে, তার সাক্ষী হিসেবে এই মিউজিয়ামে রয়েছে সিগনালিং ল্যাম্পের নানা রূপ। সেই সময়ের হ্যান্ড সিগনালিং ল্যাম্প নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ অটোমেটিক সিগনালিং ল্যাম্পে এসে পৌঁছেছে। শুরুতে যা ছিল কেরোসিনের বাতি, তা বাল্ব থেকে বর্তমানে এলইডি লাইটে পরিবর্তিত হয়েছে। এ ছাড়াও আছে টেলিগ্রাফি থেকে টেলিফোনের পরিবর্তনের কথা। ট্রেন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিস, যেমন— প্যানেল লকিং সিস্টেম, ইন্টার লকিং সিস্টেম, প্ল্যাটফর্ম লাইট, পয়েন্ট ইন্ডিকেশন ল্যাম্প, টিকিট স্টক বক্স, টিকিট ডেটিং মেশিন, ওয়েট মেশিন, বিভিন্ন ধরনের লিভার ইত্যাদি নানান ঐতিহাসিক জিনিস আমাদের তখন আর এখনের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে। এখানে রাখা আছে পুরনো

দিনের আয়না, ড্রেসিং টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, যা কিনা তখনকার দিনে থাকত ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে। রেলের সূচনালগ্নের বেশ কিছু ছবি দেখে বোঝা ছাড়াও প্রচুর নদী রয়েছে। এইসব জায়গায় যোগাযোগরক্ষার জন্য রেল দপ্তর কত দুর্গম অঞ্চলে ব্রিজ তৈরি করেছে, তার সব ছবি আছে দেওয়াল জুড়ে।

এ তো গেল মিউজিয়ামের ভিতরের কথা। বাইরের লনটিও দেখার মতো। সেখানে দর্শকদের জন্য রয়েছে প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত সব ধরনের রেলের লাইন। সেই সময় রেলগাড়ি কত সরু পাতের উপর দিয়ে চলত, আর ধীরে ধীরে তার ভারবহনের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সরু পাত কত মোটা হয়েছে, তার টুকরোগুলি একটা স্ট্যান্ডে পরপর রাখা হয়েছে। কীভাবে আগে হাত দিয়ে লিভার ঘুরিয়ে সিগনাল গেট বন্ধ করা হত তা এখানে হাতেকলমে দেখানো হয়। এ ছাড়াও বাইরের বাগানটিতে রয়েছে বিভিন্ন আকারের ট্রেনের চাকা, রেললাইন ঠিক আছে কি না তা দেখার জন্য ব্যবহৃত ইন্সপেকশন ট্রলি।

২০০৯ সালে অস্থায়ীভাবে রেল সংগ্রহশালা ছিল কোচবিহার স্টেশনের একটি ঘরে। সে সময়ের নাম হেরিটেজ মিউজিয়াম। পরবর্তীতে এটি স্থায়ীভাবে স্টেশন সংলগ্ন পাশের রেলের জমিতে তৈরি করার উদ্যোগ নেন রেল কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে অবশেষে তা বাস্তব রূপ পায়। এই রেল মিউজিয়ামটি যে মদনমোহন বাড়ির আদলে হবে তাও মুখ্যমন্ত্রীই ঘোষণা করেন। এর পর ২০১২ সালে শুরু হয় ৬,০০০ বর্গফুটের এই মিউজিয়াম তৈরির কাজ, শেষ হয় ২০১৫-য়। এর পর ২০১৬-র ২ ফেব্রুয়ারি রেলের জেনারেল ম্যানেজার উদ্বোধন করলেও সাধারণ দর্শকদের জন্য ৩১ মার্চ থেকে মিউজিয়ামের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, মদনমোহন বাড়ির আদলে তৈরি এই মিউজিয়ামটির স্ট্রাকচারাল ও আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং-সহ পুরো বিল্ডিংটি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন কোচবিহারের রেলওয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আর্কিটেকচারাল কনসালট্যান্ট মানবকুমার বসু। জানালেন, প্রায় ৩৬ কোটি টাকার প্রোজেক্ট ছিল এটি। কাজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ড্রয়িং বদলাতে হয়েছিল। তাঁর কাজে রেলের জেনারেল ম্যানেজার ভীষণ খুশি হয়েছেন বলেও জানান তিনি। মিউজিয়ামটিকে যত্ন করে সাজিয়েছেন রেলের কর্মীরা। প্রত্যেকের আন্তরিক সহায়তায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে মিউজিয়ামটি।

কোচবিহার রেল মিউজিয়ামে একবার ঢুকে পড়লে তা ভাল লাগতে বাধ্য। এখানে চোখের সামনে প্রায় অবলুপ্ত জিনিসগুলো দেখে ইতিহাসকে ছুঁতে পাওয়ার একটা আনন্দ পেতে পারেন দর্শকরা। মিউজিয়ামের তিনটি গ্যালারি সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। সুন্দর পরিবেশে মিউজিয়ামের কর্মীদের আন্তরিক ব্যবহার সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে দর্শকদের বুঝিয়ে বলা, প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধে জানানো এবং দর্শকদের সব প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখে দেন কর্তব্যরত কর্মীরা। কিন্তু দুঃখের কথা, এখানে কোনও স্থায়ী কর্মী নেই। রেলের নির্দিষ্ট কিছু কর্মী পালা করে এখানে দায়িত্ব সামলান। আরও একটি বিষয় হল, সারাদিনে মাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকে এই মিউজিয়ামটি। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য খোলা থাকার ফলে অনেক মানুষ এসে বন্ধ দেখে ফিরে যান। এ ছাড়াও এত সমৃদ্ধ রেল মিউজিয়ামের কথা এখনও এখানকার অনেক মানুষই জানেন না। উত্তরবঙ্গে পর্যটনকে বাড়তি মাত্রা দেওয়া হচ্ছে। তাই এই রেল মিউজিয়াম সম্পর্কে দর্শকদের জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ, হাতে গোনা কয়েকটি রেল মিউজিয়ামের মধ্যে কোচবিহার রেল মিউজিয়াম একটি। সেখানে চালু হবার পাঁচ মাস পরও দর্শকের সংখ্যা ৮০০ ছাড়ায়নি—এটা সত্যিই বেদনার।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

হোম যেখানে ওয়াইল্ড

বক্সা বাঘবনে নতুন ঠিকানা

ডুয়ার্সে বক্সা বাঘবনের মাঝে নতুন টুরিস্ট ডেস্টিনেশন ২৮ মাইল বন গ্রাম। সেখানে ওয়াইল্ড হোম একটি নতুন রিসর্ট। চারদিকে নিবিড় ঘন অরণ্য, সেখানে সবুজের কত শেড, পিকাসো হিমসিম খেয়ে যেতেন সেই শেড তুলিতে ধরতে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় নীল পাহাড়, শীতে গোটা গ্রাম জুড়ে হলদে ঢেউ খেলে যায় সর্ষে খেতে— এমনই এক ছবির মতো সুন্দর এই ২৮ মাইল গ্রাম। গ্রামের নাম এমন হবার কারণ কি রাজধানী কোচবিহার থেকে এর দূরত্ব? হবেও বা। কিন্তু নামে কিবা এসে যায়? এই ছোট্ট গ্রামে এই হোম স্টে বা রিসর্ট গড়ে তুলেছেন কয়েকজন প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ এই গ্রামেরই একজন স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায়। ছোট্ট দোতলা কাঠের বাংলো, একদম পুরানো বনবাংলোর আদলে তৈরি। দোতলায় তিনটে বিরাট ঘর। সামনে পেছনে পাশে বড় খোলা বারান্দা। এক কাপ চা নিয়ে পাহাড় বনের দিকে তাকিয়ে কেটে যেতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সাথে যদি থাকে পছন্দের বই তবে জমে যাবে। ঘরগুলো বড়, দুটো বিরাট খাট, বড় পরিবার হলেও কুছ পরোয়া নেই। বিদ্যুৎ, জল সবই রয়েছে। নিচে দুটো বড় ঘর। একটি চারজনের আরেকটি তিনজনের। ড্রাইভারদের আলাদা থাকবার ঘর, পার্কিংয়ের কোনও সমস্যা নেই। ঢিলছোঁড়া দূরে জয়ন্তী কিন্তু জয়ন্তীর ঘিঞ্জি পরিবেশ নেই, জলনিকাশির সমস্যা নেই। মেঘের গায়ে যে বক্সা জেলখানা সেখানে ট্রেক করা যায়, আরও উপরে ট্রেক করলে স্বর্গছেঁড়া সব গ্রাম লেপচাখা, আদমা, রূপমভ্যালি, নামগুলো শুনলেই মন মুহূর্তে উড়ে চলে যায়।

এছাড়া জঙ্গলে জিপ সাফারি, ওয়াচ টাওয়ার, পোখরি পাহাড়, মহাকাল এইসব প্রথাগত ভ্রমণ যা জয়ন্তীর থেকে হয় সে সব তো আছেই, উপরি পাওনা মহার্ঘ্য নির্জনতা, অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। চাইলে বিদেশ ভ্রমণে ফুন্টশোলিং বা কোচবিহার রাজবাড়ি এমনকি রসিকবিলও ঘুরে আসতে পারেন।

বক্সা বাঘবনে বাঘ আছে কিনা ভগবান জানেন কিন্তু বন এখনও যা আছে, আর বন্যপ্রাণী, তা বাংলায় আর কোথাওই নেই। আর এই হোম স্টে-তে বসে আপনি দর্শন পেয়ে যেতে পারেন হাতি, হরিণ আর ময়ূরের। মধুচন্দ্রিমার জন্য যদি অরণ্য পছন্দ করেন তবে এই ওয়াইল্ড হোম আপনাকে দিতে পারে কাঙ্খিত বনবাস। মধুচন্দ্রিমার দিন অনেক আগে পেরিয়েছে বলছেন, তাতে কী? আপনারাও আসতে পারেন, এসে দেখুন না কি ম্যাজিক হয়!

যোগাযোগ করুন, বক্সা— ০৩৫৬৪২০০০৯০, ৯৭৭৫৪২৫৩৫৯।

শিলিগুড়ি— ৯৪৩৪৪৯৫৩১০, ৯৬৪১৯১৬৭০০।

এইসব শিশু কন্যারা কৈশোরে পা দিতেই হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়?

ডুয়ার্সের চা বলয়ে আগমনীর পরিবর্তে কন্যা বিসর্জনের কান্না

শরতের আকাশে পেঁজা টুকরো টুকরো সাদা মেঘের নৌকা অসীম নীল দিগন্তে ভেসে চলা, মাটিতে কাশ ফুলের হিল্লোল, এরই সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসা শিউলির সৌরভ জানিয়ে দেয়, আমাদের ঘরের মেয়ে লাল আলতায় রাঙানো দুই কমল পায়ের ছন্দ তুলে আসছে। সে তো আমাদের কাছে মৃন্ময়ী দেবী দুর্গা নয়, সে আমাদের ঘরের চিন্ময়ী। আদরের দুলালি প্রবাসে স্বামীগৃহ থেকে মায়ের সুধাময় কোলে বসে মাকে তার এতদিনের অনুপস্থিতির শূন্যতাকে ভরিয়ে দিতে প্রতিবারের মতো আসছে, মায়ের আনন্দাশ্রুর ধারায় নিজে স্নাত হতে। তাই ঘরে ঘরে চলে তারই অধীর অপেক্ষা। হোক না মাত্র তিন দিনের জন্য সে আগমন, মণ্ডপ আর ঘরকে শূন্য করে তাকে পতিগৃহে সুখের সাগরে যাত্রা করিয়ে দিয়ে তাই আকাশে ভরিয়ে দেয়, 'আবার কবে, বছর পরে'— সেই প্রতীক্ষার আগাম বার্তা। কন্যার সুখ মাতার সুখ। কন্যার সুখ পিতার সুখ। তাই কন্যার পতিগৃহে যাত্রার পর শূন্য ঘরের শূন্য হৃদয়ের মধ্যেও থাকে এক আনন্দ। মেয়ে আছে পতিগৃহে সুখের সাগরে।

মায়ের হৃদয় তো সবারই এক। অর্থের কৌলীন্যে দেমাকি মা আর খুদকুঁড়োর ক্ষুন্নিবৃত্তিতে জীবনধারণে মায়ের বহিরঙ্গের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, হৃদয়ের স্পন্দন তো একই। মহানগরের সুদৃশ্য প্রাসাদে মায়ের হৃদয় যেমন মেয়ের আগমনের পদধ্বনির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, একই স্পন্দন অনুভূত হয় ডুয়ার্সের বন্ধ বা আধাবন্ধ, এমনকি খোলা বাগানেরও অনিশ্চিত মজুরির অনাহারী চা শ্রমিক-মায়ের তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে। তাদেরও দু'চোখ খুঁজে বেড়ায় তাদের মেয়েদের খোঁজে। সেই কবে চলে গিয়েছে মেয়েটা— কোথায় গিয়েছে, কেমন আছে, কবে আসবে কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না।

ডুয়ার্স তরাইয়ে ঘটছে নারী ও শিশু পাচারের রমরমা কারবার

ডুয়ার্স চা-বাগানে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা আজ রূপান্তরিত হয়েছে এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যায়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে শিশু ও নারী পাচারচক্রের যে এক বিশাল কারবার চলছে, তার বিষাক্ত শাখা বিগত দুই দশক ধরে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোতে ভয়াবহ আকারে জাল ছড়িয়ে দিয়েছে। যদিও ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) যা তথ্য দিয়েছে, তার সঙ্গে প্রকৃত তথ্য মেলে না। তারা একই সঙ্গে ইমমরাল ট্রাফিক (প্রিভেনশন অ্যাক্ট)— এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বলে জানালেও, তারাই কিন্তু তাদের রেকর্ডে জানাচ্ছে, নাবালিকাদের নানা অসামাজিক কাজে ব্যবহার (আইপিসি ৩৬৭) এবং তাদের দেহব্যবসার জন্য বিক্রি করার অপরাধে (আইপিসি ৩৭২) অভিযুক্তদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এর একটা কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে সমস্ত দরিদ্র শ্রমিকের পরিবারের মেয়েরা

চা-বাগান	অবস্থা	বালিকা	বালক	মোট
ইনডং	রুগ্‌ণ	৫	৬	১১
গ্রাসমোর	রুগ্‌ণ	৫	৪	৯
রেড ব্যাঙ্ক	রুগ্‌ণ	৭	৫	১২
চালসা	ভাল	৫	৪	৯
নয়াসালি	রুগ্‌ণ	৫	৫	১০
সামসিং	রুগ্‌ণ	৫	৪	৯
ভার্নাবাড়ি	রুগ্‌ণ	৫	১	৬
ঢেকনাগড়া	রুগ্‌ণ	৬	৩	৯
রাধারানি	রুগ্‌ণ	৪	৩	৭
রহিমাবাদ	রুগ্‌ণ	২	১	৩
রাইমাটাং	রুগ্‌ণ	৫	৪	৯
সাতালি	ভাল	৫৬	৪৫	১০১

আড়কাঠির জালে পড়ে এভাবে নারী মাংসের বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তাদের বাড়ির অসহায় এবং অজ্ঞ বাবা-মায়েরা জানে না কোথায় তারা হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খোঁজে যাবে। তারা ঠিকানা জানে না, জানলেও সেখানে যাওয়ার সাহস তাদের নেই। এ ছাড়া দারিদ্রের তীব্র দহনজ্বালা সইতে না পেরে অনেকে তাদের এই মেয়ে এবং শিশু পুত্রসন্তানকে দু'মুঠো ভাতের জন্য তুলে দিয়ে বাঁচার চেষ্টার মতন নিদারুণ সিদ্ধান্ত বুকফাটা আর্তনাদের অব্যক্ত আর্তিতে হৃদয়কে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে।

উত্তরবাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জুড়ে চা-বাগিচার সংখ্যা ৪৫০। এর মধ্যে ডুয়ার্সে যে প্রায় ২০০টি চা-বাগান আছে, সেখানে বলতে গেলে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা ও শিশু পাচার প্রায় সব বাগানেই ঘটে চলেছে। কতজন এই পাচারের শিকার, তার প্রকৃত সংখ্যার কোনও সরকারি তথ্য নেই। তবে অধ্যাপক রঞ্জিত ঘোষ, বিখ্যাত গবেষণামূলক পত্রিকা ইকনমিক এবং পলিটিক্যাল উইকলিতে তাঁর যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করেছেন, তাতে যে সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ২০১০ সালে তাতে ১২টি চা-বাগানের স্যাম্পেল বা নমুনা সমীক্ষাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। সেই আলোচনা অবশ্যই হবে। সেখানে যাবার আগে দু'টি সদ্য ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে কোন পরিস্থিতিতে জন্মদাত্রী তাদের নাড়ি-কাটা অমৃত সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছে, তার একটি ছবি অনেকটা স্পষ্ট হতে পারে। শহরের কাছে একাই আসতে গিয়ে এক মহিলা (অনুমান, কাছের কোনও বাগানের) এক ঝোপের ধারে এক সন্তান প্রসব করে। আশ্চর্য এ দেশের জীবনী শক্তি। নেই কোনও নার্সিং হোম, হাসপাতাল, এমনকি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ধাইয়ের পরিষেবা। তবু সে একটা সুস্থ সন্তানের জন্মই শুধু দিল তা নয়, নিজের হাতে নাড়ি কেটে তাকে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করল। সভ্য সমাজের মানুষ প্রকাশ্যে এমন একটা 'অশালীন' ঘটনায় তাদের ছেলেমেয়েদের চোখ ঢেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিল। কেউ কিন্তু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। তবে এই মেয়েটি তো সুখী ভারতের সুখী প্রসবিনী নয়। তাই এদের প্রাণশক্তি যেন সেই প্রবাদবাক্যের কই মাছের প্রাণের মতন। রান্নার ফুটন্ত তেলে ছাড়ার আগে পর্যন্ত সে নাকি বেঁচে থাকে। এই মেয়েটি প্রসব করার পর ঘণ্টাখানেক অবসন্ন অবস্থায় শুয়ে থেকে তার সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। গায়ে জড়ানো কাপড়ে সেই প্রসবের রক্ত। হাত পেতে সাহায্য চাইল চলমান পথচারীদের কাছে। প্রসবের দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে এমন একাকী মেয়ের দিকে কেউ কেউ দু'-একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। দু'দিন তাকে দেখা গিয়েছিল তার সদ্যোজাত সন্তানটিকে নিয়ে শহরের রাস্তায়। তারপর এক দম্পতির হাতে সন্তানটিকে কয়েকটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে উধাও হয়ে যাবার পর শহরময় ঢি ঢি পড়ে গেল। এমন রাক্ষুসে মা না হলে নিজের শিশুসন্তানকে এমনভাবে বিক্রি করতে পারে? পুলিশ এল। সেই দম্পতির কাছ থেকে সেই শিশুসন্তানকে উদ্ধার করা হল। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোতে এটা কোনও অপরাধ বলে তো রেকর্ড হবে না।

দ্বিতীয় ঘটনা, এক মা তার দুই সন্তানকে বিক্রি করতে এসে ক্রেতার সঙ্গে দর কষাকষির স্বর উচ্চগ্রামে চলে গেলে কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় করতে দেখে তারা চম্পট দেয়। পুলিশ আসে। মেয়েটি জানায়, তার কাজ নেই। স্বামী চলে গিয়েছে। কাজের সন্ধানে দুই সন্তানকে নিয়ে এসে কোথাও কাজ পায়নি। কেউ তাদের বারান্দায় দাঁড়াতেও দেয়নি। না খেয়ে আছে তারা। দুটো লোক তার সন্তানদের নিয়ে সাত হাজার টাকা দেবে বলেছিল, এখন বলছে পাঁচ হাজার। ওদের ওরা ভাল জায়গায় কাজে ঢুকিয়ে দেবে। বাঁচতে গেলে তার আর কী করার ছিল? এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পরে খাবারসহ নানা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এসেছে। তবে ভিক্ষের দানে কতদিন চলবে? দরকার যে বাগান খোলা। কেজো হাতের জন্য কাজ। শারদ তাই এখানে কোনও আনন্দের বার্তা আনে না। ক্ষুধার হাহাকারে আসে না উৎসবের বার্তা। ডুয়ার্সের এই কান্নার উৎস ও মানুষ বিক্রির হাটের প্রকৃত চেহারার তথ্য আগামী সংখ্যায় দেওয়ার ইচ্ছে রইল।

সৌমেন নাগ

'এখন ডুয়ার্স'-এর গ্রাহক সংক্রান্ত কথা

আমরা দুঃখিত, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং কাগজে এর আগে ঘোষণা সত্ত্বেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক নেওয়া শুরু করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠকের ঠিকানায় পত্রিকা পৌঁছাবার নেটওয়ার্ক আমরা এখনও তৈরি করে উঠতে পারিনি। আমরা প্রতিনিয়ত বহু ফোন এবং মেল পাই গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ নিয়ে। সকলের কাছে আমাদের একটাই উত্তর, যেখানে যেখানে বাড়িতে/অফিসে কাগজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বার্ষিক গ্রাহক হওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই— পত্রিকা এমনিতেই আপনার কাছে পৌঁছাবে। আর প্রত্যন্ত এলাকার পাঠকদের অনুরোধ করব, আপনারা নিকটবর্তী কাগজবিক্রেতার স্টলে আগাম বলে রাখলে 'এখন ডুয়ার্স' আপনার জন্য রাখা থাকবে। পাঠকের এই ভালবাসা মূলধন করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

(পত্রিকা না পেলে ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে)

শারদ শুভেচ্ছা

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত রকম উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্য, কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রীতে এগিয়ে আছে তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক তথা পঞ্চায়েত সমিতি। এবারও কন্যাশ্রীতে প্রথম এই সমিতি। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে সমস্ত বিভাগের ক্ষেত্রেই। এবছর রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের উন্নতিসহ কৃষক, মৎস্যজীবি, গরীব মানুষদের জন্য অনেক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করা হবে। ২০১৩ থেকে কাজ শুরু করে এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে আজ বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

পুজোর মরশুম সবার ভালো কাটুক, সেই শুভেচ্ছা রইল তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি তথা সমস্ত ডুয়ার্সবাসীর জন্য।

রাজু লামা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
(তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি)

জগদীশ বর্মণ
সভাপতি
সামিউল ইসলাম
সহকারী সভাপতি
(তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি)

তুফানগঞ্জ ১নং ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি, কোচবিহার

উৎসবের প্রাক্কালে চা-বাগানে কালো মেঘ!

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি-বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **দ্বিতীয় পর্ব**।

আসছেন দেবী দুর্গা। আর পক্ষকাল বাকি। 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিনিধি হিসেবে এই লেখা যখন লিখছি বা ছেপে যখন বেরবে, তখন মহালয়ার প্রাক্কালে লেখা এই প্রতিবেদনের কিছু কিছু অংশ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে পাঠকবর্গের। কারণ, প্রতি মুহূর্তেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে। হয়তো ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি সনদের সমাধান হয়ে বাগিচা শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটবে, নয়তো আবারও হয়তো আপস-মীমাংসার মাধ্যমে 'যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ' ভেবে সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর অথবা বিস্তীর্ণ চা-বাগিচা জুড়ে ধর্মঘট-অশান্তি-অরাজকতা। তবে হিসেব বলে, আসন্ন শারদোৎসবের প্রাক্কালে উত্তরের চা শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনসংগ্রামের তরি টলমল। বৃহৎ চা-বাগিচার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে প্রায় ৩০,০০০ নতুন চা-বাগিচা আছে। এই চা-বাগিচা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুখকর নয়। ফলে বাগিচা শ্রম আইনের আওতায় এনে ছোট চা-বাগানের শ্রমিকদের পরিষেবার দিকটি চাঙ্গা করা প্রয়োজন। ছোট চা-বাগিচা শ্রমিকদের জন্য মালিকপক্ষ কেন শ্রমিক আবাস তৈরি করবে না— এই প্রশ্ন যেমন উঠছে, তেমনি স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। দেবী দশভুজা নৌকাপথেই আসুন বা গজরাজে চেপেই আসুন বা দোলাতেই আসুন না কেন, তিস্তা-তোর্সা-জলঢাকা-সংকোশ-মানসাই-কালজানির পাড়ের মানুষগুলির জীবনসংগ্রামের করুণ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবারে সদয় হবেন বলে আশায় বুক বেঁধে বসে আছেন ঈশ্বরবিশ্বাসী চা শ্রমিকরা। সময়ই সবকিছু বলে দেবে।

সত্যিই, সময়ই সবকিছু বলে দেয়। ১৮ তারিখ রাত্রিবেলায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চা-বাগিচার এবারের দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে কেমন আছে 'এখন ডুয়ার্স'-এর চা শ্রমিকদের মন-মানসিকতা, পুজো বাজারের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং 'এখন ডুয়ার্স' ও 'এখন ডুয়ার্স'-এর দুর্গা পুজোর প্রেক্ষিত, মানবিক মেলবন্ধন, সামাজিক ঐক্যকে সামনে রেখে মহালয়ার প্রাক্কালে একটি মননশীল প্রতিবেদন জমা দিতে যখন নির্দেশ এল সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে, তখন সত্যি বলতে কী একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। এত স্বল্প সময়ে কী লিখব? বোনাস চুক্তি হয়নি। প্রায় দশ লক্ষ চা শ্রমিক পরিবার উদ্‌বিগ্ন, ব্যবসায়ীদের মুখ ভার, পুজোর মুখে উত্তরের বৃহৎ শিল্পে ধর্মঘটের আশঙ্কা— সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। যখনই ১৯ শতাংশ বোনাস চুক্তির খবর চলে এল,

তখনই মহল্লায় মহল্লায় স্বস্তির রেশ। স্বস্তি বাগিচা শ্রমিকদের, স্বস্তি মালিকদের, স্বস্তি বাজারের, বিশেষত ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের, স্বস্তি সরকারের, সর্বোপরি স্বস্তি আমারও যে, এবারে প্রাণভরে আনন্দিত চিত্তে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা যাবে। সত্যিই লেখাটা লিখতে বসে নিজেরও খুব আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, যেসব শ্রমিক পরিবারের মুখে হাসি ফুটল, সেইসব পরিবারের অন্ততপক্ষে শতাধিক সন্তানের মুখের অদৃশ্য হাসি আমি মানসচক্ষে অবলোকন করছি আমার ছোট্ট আবাসিক বিদ্যালয়ে, যেখানে শিক্ষকতা এবং পাশাপাশিভাবে সমাজসেবার দায়িত্ব নিয়ে সরকারি সহযোগিতায় নিখরচায় পড়াশোনা করছে যে আদিবাসী শিশুরা, তাদের শিক্ষাদানের কাজে আমাদের মতো কিছু শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

হ্যাঁ, আমার নিজের বিদ্যালয় ধাপগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড আশ্রম টাইপ হাই স্কুল থেকেই ক্ষেত্রসমীক্ষা শুরু করলাম। আশ্রমিক আবাসিক এই বিদ্যালয়টিতে ১৮০ জন ছাত্র আবাসিক, যাদের মধ্যে এই মুহূর্তে ১৫৭ জন আদিবাসী আর ২৩ জন তপশিলি জাতিভুক্ত। ‘বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান’-এর মিনি ডুয়ার্স আমাদের ছাত্রাবাস। কে নেই? ইসলামপুরের অগাস্টিন হেমব্রম, রাহুল মুর্মু, ধনীয়াল হাঁসদা, খড়িবাড়ির বুধিরাম বেসরা, কুমারগ্রামের জিতেশ লাকড়া, মেটেলির অনীশ ওঁরাও, আলিপুরদুয়ারের বিজন তির্কি, ভাণ্ডারপুর সিখারপুরের আকাশ মুন্ডা, সোনাপুর-চোপড়া-বিধাননগরের সমর কিসকু, সুনীল মার্ডি, পরিমল সোরেনরা, হলদিবাড়ি সাতকুড়ার অশোক মুর্মু, বিষ্টু হেমব্রম, বিশনাথ এক্কা, বারোবিশার রাজকুমার টিগ্গা— সকলেই চা-বাগিচার সন্তান।

—কী রে বিশুরাম, পুজোতে কী নিবি?

চুপ করে থাকে বিশুরাম। ছোট্টখাট্ট মিশকালো চেহারার মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো বার করে হাসে বিশুরাম। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র।

—কিছু লিবো না স্যার, বাবার পয়সা নাই।

—কেন, পয়সা নেই কেন? কী করে তোর বাবা?

—চা-বাগানে কাম করে। বাগানের কামকাজ হয় না, বাবার পয়সা নাই বলেছে, ইবার পুজোয় জামাকাপড় দিবেনি।

—কয় ভাই, কয় বোন তোরা?

—দুই ভাই, এক বোন।

বিশুরামের বাড়ি লঙ্কাপাড়া চা-বাগানে। ডানকান গোষ্ঠীর ১৪টি চা-বাগানের মধ্যে যে সাতটিকে অধিগ্রহণের জন্যে গত ২৮ জানুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কেন্দ্রের বাণিজ্যমন্ত্রক, লঙ্কাপাড়া চা-বাগান তাদের মধ্যে একটি। অন্যগুলি হল বীরপাড়া, গ্যরগান্ডা, তুলসীপাড়া, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া এবং ডিমডিমা। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক জানিয়েছিল, রুগ্‌ণ বাগানের পরিচালনভার নতুন সংস্থাকে হস্তান্তরিত করা হবে। সংস্থা নির্বাচনের জন্য এর পর টি-বোর্ড দরপত্র আহ্বান করে। শ্রমিকদের বেতনের পরিমাণ সাতটি চা-বাগান মিলিয়ে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। বকেয়া মেটাতে হবে— এই শর্তে উত্তরবঙ্গে ৭টি চা-বাগান চালানোর জন্য ডানকান গোষ্ঠীকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। কীভাবে চা-বাগান চালানো হচ্ছে তা নিয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর টি-বোর্ডকে রিপোর্ট দিতে হবে ডানকান গোষ্ঠীকে এবং চা-বাগানের যন্ত্রপাতিও তারা সরাতে পারবে না।

বিশুরামের বাবা বুধুরাম জানাল, ‘বাগান খুলবে বলে জেনেছি, কিন্তু কী পাব জানি না। পুজোয় ছেলেমেয়ের জন্য নতুন জামা-জুতো কিনে দিতে পারব কি না জানি না। সবই ভাগ্য।’ অসহায়তা শুধু বিশুরামের বাবার নয়, বন্ধ চা-বাগানগুলির লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পরিবারের। প্রতি বছরই দেখি মহালয়ার আগে পরীক্ষাপর্ব মিটে গেলেই ছেলেদের বাড়ি যাওয়ার তর সয় না। কারণ ওরা জানে, বাবা-মায়ের হাতে বোনাস বা উপার্জনের পয়সা এসেছে। এবার জামা-জুতো মিলবেই। তাই যদি বলা যায় আর কয়েকদিন পরে ছাড়া হবে, তখন ছুটি দেওয়া যাবে না তাহলে কেঁদেকেটে আমাদের ব্ল্যাকমেল করে অভিভাবক নিয়ে এসে ছুটি আদায় করে। কিন্তু এবারে অত্যন্ত শান্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন ওরা ছুটিও চাইতে আসেনি। হয়ত সহজ-সরল সাদাসিধে এই শিশুগুলোও বুঝে গিয়েছে

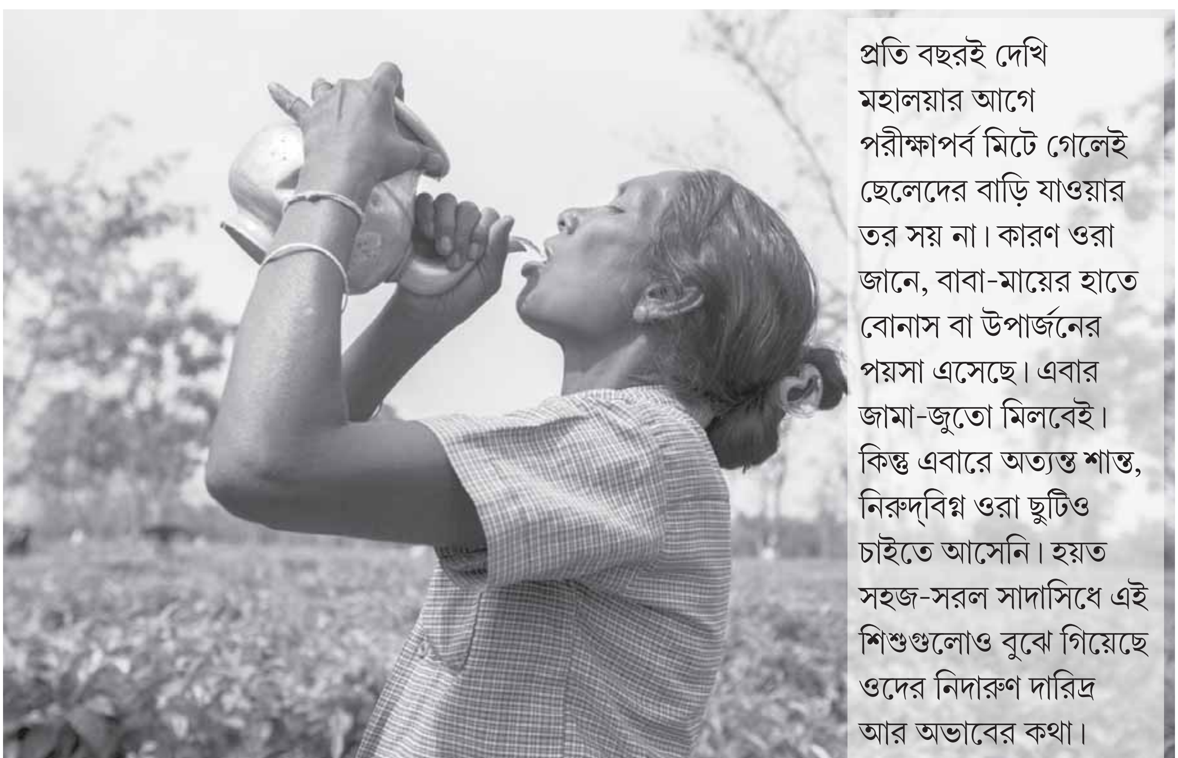

প্রতি বছরই দেখি মহালয়ার আগে পরীক্ষাপর্ব মিটে গেলেই ছেলেদের বাড়ি যাওয়ার তর সয় না। কারণ ওরা জানে, বাবা-মায়ের হাতে বোনাস বা উপার্জনের পয়সা এসেছে। এবার জামা-জুতো মিলবেই। কিন্তু এবারে অত্যন্ত শান্ত, নিরুদ্‌বিগ্ন ওরা ছুটিও চাইতে আসেনি। হয়ত সহজ-সরল সাদাসিধে এই শিশুগুলোও বুঝে গিয়েছে ওদের নিদারুণ দারিদ্র আর অভাবের কথা।

ওদের নিদারুণ দারিদ্র আর অভাবের কথা। তাই বাড়ি যাবার, বাবা-মায়ের কাছে যাবার তাগিদ নেই এ জন্যই যে, ওরাও হয়ত জানে, বাড়ি গেলে আশ্রম হস্টেলের এই ডাল-ভাতটুকুও হয়ত জুটবে না।

আসলে 'এখন ডুয়ার্স' আমাকে বড় কঠিন দায়িত্ব দিয়েছে বন্ধ চা-বাগিচা এবং খোলা চা-বাগিচার প্রাক্-পুজো আবহকে তুলে আনতে। জানি না দুঃসাহসিক এই কাজে পাঠকবর্গকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারব। কারণ, ক্ষেত্রসমীক্ষাও সময়াভাবে বেশি করে উঠতে পারিনি। তবে বীরপাড়া, গ্যরগান্ডা, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া, লঙ্কাপাড়া বাগিচাগুলিতে সার্ভে করে যে চিত্র পেয়েছি তা ভয়ংকর। চারটি বন্ধ চা-বাগিচায় মাধ্যমিক ও দু'টিতে বাগানের সন্তানরা উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সুযোগ পেলেও বাগান থেকে বিদ্যালয়গুলির দূরত্ব অনেক। যানবাহনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা ভয়াবহ। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ১২টি চা-বাগানের মধ্যে মাত্র ৪টিতে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে। ধুমচিপাড়া, হান্টাপাড়া চা-বাগানের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষয়রোগ, ফুসফুসের অসুখ, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ। অপুষ্টির জন্য ক্ষয়রোগ শ্রমিকের নিত্যসঙ্গী। চায়ের গুঁড়ো নিঃশ্বাসের সঙ্গে যাবার ফলে ফুসফুসের রোগ, স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে কাজ করার ফলে নানা ধরনের চর্মরোগ, তা ছাড়া ম্যালেরিয়া, আমাশা বা রক্ত আমাশা তো লেগেই আছে। বিশাল এই চা সাম্রাজ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তো দূরের কথা, চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে ওষুধও নেই।

আদিবাসী শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কোনও চেষ্টা নেই। অথচ বীরপাড়া, লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়াতে চোখে পড়ল রাস্তায় রাস্তায় হাঁড়িয়া আর দেশি মদের ঠেক। ভাতের বদলে দেশি মদের মাটির গ্লাস বা তাড়ি অথবা হাঁড়িয়া আর নগদ কিছুটা টাকা হাতে গুঁজে দিলেই তো কেল্লা ফতে। উত্তরবাংলায় চা-বাগিচার সংখ্যা ৪৫০-এরও বেশি। একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই প্রায় দেড়শোটি বাগিচা। জেলার অর্থনীতি মূলত চা-বাগিচানির্ভর। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ মালিক চা শ্রমিকদের অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়ে বাগানগুলিকে পরিত্যক্ত করে চলে গিয়েছে। বকেয়া রেখে গিয়েছে শ্রমিকদের বিপুল পরিমাণ মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ এবং গ্র্যাচুইটির পাওনা টাকা। শ্রমিকরা প্রায় সকলেই আদিবাসী জনজাতিভুক্ত।

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত চোখে পড়ল কুমারগ্রাম, সংকোশ আর নিউল্যান্ডসে। নিউল্যান্ডসের আদি নাম ধুমপাড়া। বাগানের প্রাকৃতিক শোভা অসাধারণ, এখানে চা-পাতার মদির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রমিক লাইনে শোনা যায় মাদলের শব্দ। সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে তারা গান গায়, দূর থেকে তা শোনা যায় কুলি লাইনের পাশ দিয়ে গেলে। নিউল্যান্ডসের রাধাগোবিন্দ মন্দির, দুর্গোৎসবে সাত দিনব্যাপী মেলা সর্বজনবিদিত। নিউল্যান্ডস বা ধুমপাড়ার মেলায় বহারোবিশা, কামাখ্যাগুড়ি, এমনকি কলকাতা, আসাম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকেও পসারিরা আসে। মেলায় আসে ছোটখাটো সার্কাস, নাগরদোলা, টয় ট্রেন, গানের দল, নাচের দল। নিউল্যান্ডস থেকে রায়ডাক নদী ১ কিলোমিটারের মতো, হেঁটেই যাওয়া যায়। রায়ডাকের তীরে কুলবনে অগুনতি পাখির ঝাঁক। নিউল্যান্ডস থেকে সেই হাড় হিম করা কালীখোলা, যা একদিন কেএলও'দের গুপ্ত ঘাঁটি ছিল তা বড়জোর ৪-৫ কিলোমিটার হবে। হেঁটেই গেলাম আমার ছাত্র রায়ডাক চা-বাগানের জিতেশ লাকড়াকে নিয়ে। পথে পেলাম অগুনতি বানর আর বনমুরগি। কালীখোলা সংকোশ নদীর ঝিরঝিরে ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে এক অনির্বচনীয় পুলক, এক অজানা আনন্দ দেহ-মনে শিহরন তোলে।

তিনটি বাগান বর্তমান আর্থিক মন্দার যুগেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চা-বাগিচার বাবু বা কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছে। আজ তারা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। এসব বাগানের আগের সেই জৌলুস আর নেই। পুজোর সময়ে শহরের দোকানদাররা বোনাসের উপর কিছুটা নির্ভরশীল থাকলেও সর্বাংশে নয়। কারণ শহর ও গ্রামগঞ্জের মানুষের হাতেও এখন পয়সা এসেছে।

নিউল্যান্ডস বাগান সংলগ্ন কুমারগ্রাম চা-বাগান। কুমারগ্রাম বাগান সংলগ্ন সংকোশ চা-বাগান। কাজেই তিনটি বাগানের মধ্যেই এক আত্মিক সম্পর্ক আছে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই তিনটি বাগান বর্তমান আর্থিক মন্দার যুগেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কুমারগ্রাম বাগান থেকে বাগানের নিজস্ব জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎসংযোগ সংকোশ পর্যন্ত গিয়েছে। কুমারগ্রাম এবং সংকোশ গুডরিক গ্রুপ-এর সাবালক বাগান। তিনটি বাগানেরই চা উৎপাদন ভাল। শ্রমিক ও বাবুরা খুশি মনেই কাজ করে। বাগান তিনটি কোনও দিনই বন্ধ হয়নি। স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। তবে চা-বাগিচার বাবু বা কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছে। আজ তারা অনেক পিছিয়ে পড়ছে। এসব বাগানের আগের সেই জৌলুস আর নেই। পুজোর সময়ে শহরের দোকানদাররা বোনাসের উপর কিছুটা নির্ভরশীল থাকলেও সর্বাংশে নয়। কারণ শহর ও গ্রামগঞ্জের মানুষের হাতেও এখন পয়সা এসেছে।

লেখাটা লিখতে বসে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে মানসপটে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমী ও ভিন্নধর্মী। মালঙ্গি চা-বাগানে থাকত ছোট মেসো। এইরকমই

এক শারদোৎসবের প্রাক্কালে মাসির আমন্ত্রণেই বাবা-মায়ের হাত ধরে সেই প্রথম ডুয়ার্সে আসা। বছর ত্রিশেক আগেকার কথা। আমি তখন মাধ্যমিক পাশ করেছি সবে। মনে আছে, সম্ভবত হ্যামিলটনগঞ্জ পর্যন্ত রেল চলাচল ছিল। ওল্ড হাসিমারায় রেল স্টেশন ছিল। মনে আছে, মেসোর পরম সুহৃদ হেল্‌থ সেন্টারের যতীন ডাক্তার, পরবর্তীকালে আমার যতীনমেসোর সঙ্গে আমরা হাঁটা-পথেই হাসিমারার মালঙ্গি চা-বাগান পৌঁছেছিলাম। আমরা লেবার লাইনের এক বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম। শ্রমিক বস্তির পরিবারের লোকজন ভাঙা চেয়ার, মোড়া এনে আদর করে যেতে বললেন। সন্ধ্যায় পৌঁছেছিলাম মালঙ্গি চা-বাগানের মাসির বাড়িতে। মালঙ্গি চা-বাগানে মাসির বাড়ির কাছেই ছিল চা ফ্যাক্টরি এবং চারদিকে চা-গাছ। কী সুন্দর পরিবেশ, না দেখলে বোঝা যাবে না। বেশ কয়েকদিন ছিলাম মালঙ্গিতে। আসলে মালঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা এখানেই যে, এটাই আমার দেখা প্রথম চা-বাগান। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন এবং পরবর্তীকালে কর্মজীবনের প্রথম লগ্নে সাংবাদিকতা এবং দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষকতা তথা লেখালেখি চর্চার ফলে আমার স্মরণে-শয়নে-স্বপনে ডুয়ার্স এবং তরাই সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে।

আসলে আমার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের স্মৃতি আর বর্তমান চেহারার মধ্যে কোনও তালমিল খুঁজে পাইনি ক্ষেত্রসমীক্ষায় এসে। কোথায় হারিয়ে গেল দুর্গা পুজোর দিনগুলিতে মেলা, নাগরদোলা, যাত্রাগান বা কবিগানের আসর? কোথায় হারাল ধামসা মাদলের দ্রিমিদ্রিমি আর ধিনতা ধিনাকের সঙ্গে দলবদ্ধ গান-নাচের অপূর্ব সুরমূর্ছনা? ইনডং, গ্রাসমোর, রেডব্যাঙ্ক, চুলসা, নয়াসাইলি, সামসিং, ভার্নাবাড়ি, ঢেকলাপাড়া, রাধারানি, রহিমাবাদ, রায়মাটাং, সাতালি থেকে অন্তত হাজার পাঁচেকের অধিক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে নানা কাজে যারা নিযুক্ত ছিল স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে, তাদের মধ্যে ২০১০ সালেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, যাদের মধ্যে আদিবাসী কিশোর প্রায় আড়াই হাজার এবং আদিবাসী কিশোরী প্রায় এক হাজার। একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগিচাগুলি থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬৭৫ জন কিশোরী/যুবতী দেশের বিভিন্ন যৌনপল্লিতে চালান হয়ে যাচ্ছে বলে তথ্যসূত্রে প্রকাশ। আসলে 'ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ' দেখে ডরায়। দিনের পর দিন কেন্দ্র এবং রাজ্যের উদাসীনতায় ক্লান্ত শ্রমিককুল আস্থা হারিয়ে আবার আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে। আপাতত মজুরি চুক্তি এবং বোনাস রফা হলেও বাগিচাগুলিতে এখনও বারুদের গন্ধ।

আর তাই মনে হয়, বিকেলবেলার চা-বাগানের চা-পাতার সেই মদির গন্ধ এবং আমেজ খুব তাড়াতাড়িই হারিয়ে গেল। মালঙ্গি বাগানে এখনও গেস্ট হাউসটি পুরনো আভিজাত্যের প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান। মালঙ্গির ফ্যাক্টরি সংলগ্ন হেল্‌থ সেন্টারের পাশাপাশি ভানাবাড়ি, সাঁতলি ও মালঙ্গি সম্মিলিত সেন্ট্রাল হসপিটাল আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মুরগি লড়াই, সপ্তাহে একদিন ফ্যাক্টরি সংলগ্ন মাঠে বড় পর্দায় সিনেমা শো চলত, আর পরদার সামনে-পিছনে মাঠের মধ্যে বসে শ্রমিকরা তারিয়ে তারিয়ে সিনেমা দেখত— এসব দৃশ্য কোথায়? পঁচিশ বছর আগেও যেমন মাদলের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছে, আজও অবশ্য মাদলের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু নেই প্রাণের উচ্ছ্বাস। মাদলের তালে তালে যুবক-যুবতী কোমরে কোমর জড়িয়ে সহজ-সরল গান গায়। কালো মেয়ে, কালো

ছেলে— কষ্টিপাথরের মতো গায়ের রং। পরনে অতি সাধারণ শাড়ি। ইদানীং ছেলেদের হাফ বা ফুলপ্যান্ট। আদিবাসীদের মধ্যে উগ্র আধুনিকতা এসেছে, সাজপোশাক বদল হচ্ছে, ভিডিয়ো সিনেমা, অশ্লীল সিনেমা, পর্নোগ্রাফি দেখার ঝোঁক বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে, একদল অ-সাদরি ভাষাভাষী মানুষ নিজেদের টাকা খরচ করে আদিবাসী বা সাদরি ভাষায় সিনেমা করছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তাঁরা যেন আদিবাসী লোকসংস্কৃতির মহান প্রেমিক। কিন্তু ময়নাতদন্তে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা সাদরি ভাষায় অনেকে কথাই বলতে পারেন না। বিকৃত উচ্চারণ, আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়াশোনা না জানার ফলে উদ্যম থাকলেও পুরো ব্যাপারটি ঘেঁটে যাচ্ছে। চা-বাগিচার আরণ্যক জীবন ও সংগীত এখনও প্রায় অক্ষত চা-বাগানের আদিবাসী সাদরিভাষী মানুষের মধ্যে। চা-বাগিচার মালিকরা সুদূর অতীতে দেশীয় আড়কাঠিদের নিযুক্ত করতেন চা শ্রমিক ধরে আনার জন্য। ছোটনাগপুর, মানভূম অঞ্চলে গিয়ে নানা প্রলোভনে ওঁরাও, খাড়িয়া, মুন্ডা, বরাইক, মাহালি, লোহারদের যদুনাথের মতো আড়কাঠিরা আদিবাসী শ্রমিক হিসাবে ধরে আনত। চা-বাগানে আজও অভাব নেই যদুনাথদের, অভাব নেই অরণ্যচারী আদিবাসীদের। আজও তাদেরই ঘামে মাখা বড় স্বাদু বিখ্যাত পানীয় চা। চা-বাগানে এখন অভাব একদল মানুষের, যাদেরই একজন সার্থক প্রতিনিধি লালশুকরা ওঁরাও।

তবে শুধুমাত্র নিকষকালো অন্ধকারই প্রদীপের নিচে থাকে না। প্রদীপের আলোকরশ্মির মধ্যে উজ্জ্বলতাও থাকে। উত্তরের চা-বাগিচাগুলিতে দুর্গা পুজোর প্রচলন কিন্তু ব্যাপক। কুলি লাইনের আদিবাসী ও অধিবাসীদের পুজো এলাকাভিত্তিকভাবে নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। লোক দেখানো বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, আছে সমর্পণের মাধুর্য। বাৎসরিক এই শারদোৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উচ্চপদ-নিম্নপদ, উচ্চজাত-নিম্নজাত, শ্রমিক-কর্মচারী-মালিক— সকলের পরিবারবর্গ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে পড়ে মাতৃ আরাধনায়। মালিকানার হাতবদল হলেও বাৎসরিক দুর্গা পুজো হয় চিলাপাতা ফরেস্ট সংলগ্ন মথুরা বাগানে। প্রতি বছর মাতৃ আরাধনায় মথুরাবাসী অংশগ্রহণ করেন অফিস ও ফ্যাক্টরির চৌহদ্দির ভিতরে বাঁধানো মণ্ডপে। বাহ্যিক আড়ম্বর থাকে না মথুরাসহ ডুয়ার্সের ছোট ছোট বাগানে। সকলের সঙ্গে সকলেই আনন্দের ভাগীদার হয়ে ওঠে। আসলে যত ছোট পুজোই হোক না কেন, আন্তরিকভাবে মাকে ডাকলে সেই

উত্তরের চা-বাগিচাগুলিতে দুর্গা পুজোর প্রচলন কিন্তু ব্যাপক। কুলি লাইনের আদিবাসী ও অধিবাসীদের পুজো এলাকাভিত্তিকভাবে নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। লোক দেখানো বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, আছে সমর্পণের মাধুর্য। বাৎসরিক এই শারদোৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উচ্চপদ-নিম্নপদ, উচ্চজাত-নিম্নজাত, শ্রমিক-কর্মচারী-মালিক— সকলের পরিবারবর্গ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে পড়ে মাতৃ আরাধনায়।

ডাক যে সরাসরি মায়ের দরবারে গিয়ে উপনীত হবে, তাতে তাদের কোনও সন্দেহই নেই। যেমন সরস্বতীপুর বা ডেঙ্গুয়াঝাড় বা বেলাকোবার শিকারপুর চা-বাগানের বিভিন্ন ধর্মীয় পরব বা পুজাপার্বণ সুশৃঙ্খলার সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে বলে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবনায় এখনও পর্যন্ত কোনও কমতি হয়নি।

মহালয়ার পরদিন থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যায় সরস্বতীপুর বাগানে। মালিক কিষান কল্যাণী জলপাইগুড়িতে থাকেন। বনেদি পরিবার। ফলে চা-বাগিচা ব্যবসাটা বোঝেন ভালই। বেশ বড় বাগান, সমস্যা আছে, আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানও হয় চটজলদি। প্রাণ আছে সরস্বতীপুর বাগানে। এই বাগানেরই মহিলা এবং পুরুষদের চা শ্রমিকদল রাজ্য রাগবিতে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে আসছেন ধারাবাহিকভাবে। বাগানে রাগবি খেলার কোচও নিয়োগ করা আছে। দুর্গা পুজোর সময়ে ঠাকুরদালান ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন করেন মহিলারা। নতুন রঙের প্রলেপ আর রংবেরঙের শিকলি কেটে সাজানো হয় মণ্ডপ। বাগানে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগায় এখন ঝোলে রঙিন এলইডি টুনি বাল্ব।

পঞ্চমী এসে গেলে মায়ের ঘরে আসার পালা। শিকারপুর চা-বাগান থেকে লরি চলে যায় বেলাকোবার মৃৎশিল্পীর কুমোরটুলি থেকে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে সপরিবার মণ্ডপে নিয়ে আসতে। বাগানে কাজ চলে, সঙ্গে চলে মাকে সপরিবার আনার জরুরি কাজ। শেষ করতে হয় বাগান থেকে চা-পাতা ফ্যাক্টরিতে আনার ফাঁকেই। একই সঙ্গে ফুলফল-সবজি-আনাজ-ভোগপ্রসাদের বাজারও সেরে ফেলা হয়। ষষ্ঠীতে বোধনের পুজোর তোড়জোড়ে ধূপ, ধুনো, পঞ্চপ্রদীপ ও নৈবেদ্য সম্ভার, এক স্নিগ্ধ পরিবেশ। ঢাকে কাঠি পড়ে, সঙ্গে উচ্চকিত কাঁসর-ঘণ্টা। শুরু হয় নানা উপাচারে মায়ের আরাধনা। শামিল হন মালিক-কর্মচারী-শ্রমিকদের পরিবার-পরিজন। পরবর্তী চারটি দিন মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী রূপে বিরাজ করেন মণ্ডপে। বরাভয় প্রদান করেন সবুজ চা-বাগিচার মঙ্গলকামনায়, আশীর্বাদ দেন পরম ভক্তদের। অবশেষে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় পর্ব সাঙ্গ হয়। চা-বাগিচাতেও বেজে ওঠে বিষাদের সুর। শূন্য, রিক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে মণ্ডপ। কী এক হারানোর বেদনায় গুমরে কেঁদে ওঠে ভক্তপ্রাণ। আবার শুরু হয় সেই একঘেয়ে, বৈচিত্রহীন পথচলা।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর দরবার

দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা সরকারের প্রতি বেশ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে, বলাই বাহুল্য। উত্তরের সাতটি জেলার মানুষের মনে ভরসা জেগেছে গত পাঁচ বছরে উন্নয়নের খতিয়ান দেখে। হতাশাও জমে রয়েছে বহু এলাকায়। পাওয়া, না-পাওয়ার যুগে মানুষ দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় নিজের ও এলাকার উন্নয়নকে। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে উত্তরের মানুষের বাছাই করা কিছু প্রশ্ন প্রত্যেক মাসে একবার তুলে ধরা হয় নবগঠিত রাজ্য সরকারের নতুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর সামনে। এবারও পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রীমহাশয়।

প্রশ্ন- আপনার এলাকার মেজর টুরিস্ট স্পট রাজবাড়ির সামনের রাস্তাকে ট্রাফিক ফ্রি, ওয়াটার লগিং ফ্রি, গার্বেজ ফ্রি করা কি সম্ভব? এই নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করছেন না কেন?

রবীন মণ্ডল, শিবপুর, হাওড়া

উত্তর- এর জন্য টাস্ক ফোর্স নয়, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভিন্ন সময় এই নিয়ে আলোচনা করছে। আসলে গাড়ির সংখ্যাটা এত বেড়ে গিয়েছে... এই অবস্থায় একটা বাস স্ট্যান্ডকে কমপক্ষে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। শহর বাড়ছে, লোকসংখ্যাও বাড়ছে। এখন সমস্ত গাড়িঘোড়া যদি শহরের ভিতর দিয়ে চলে, তবে সেখান দিয়ে লোক চলাচল করা, ছোট গাড়ি যাওয়া-আসা করা

বিষয় কোচবিহার রাজপ্রাসাদ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ সংরক্ষণে চরম অবহেলার বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ে রীতিমতো হতবাক উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রতিনিধিকে ডেকে ব্যক্ত করলেন তাঁর মতামত।

অবহেলায় রাজবাড়িটা নষ্ট হচ্ছে। ওখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আধিকারিকদের থাকার কথা, নজরদারি করার কথা, দেখভাল করার কথা তা একেবারেই হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় চাঙড় খসে পড়ছে, ড্যাম্প ধরে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে তো রাজবাড়ি পর্যটকদের কাছে তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলবে। রাজ-আমলের এই স্থাপত্যকে যেখানে সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা উচিত ছিল, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা সব নষ্ট। তবে সঠিক নজরদারি আর তার নিরাপত্তা কোথায় হচ্ছে রাজবাড়ির? কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন। আমি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এটার জন্য বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করেন। রাজবাড়ি দিয়েই লোক কোচবিহারকে চেনে। এই রাজবাড়ি আমাদের পরিচয়, এটাই আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব। এর স্থাপত্য দেখার জন্যই হাজার হাজার মানুষ কোচবিহারে আসে। তার প্রতি এতটা অবহেলা করলে কোচবিহারের ইতিহাসের প্রতি অমর্যাদা করা হবে। আমি এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এই জন্য শহরের বাইরে কোথাও একটা বাস স্ট্যান্ড করা যায় কি না তা নিয়েও ভাবা হচ্ছে। এ ছাড়া লোকেরা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ফুটপাথ দখল করে নিয়ে পসরা সাজিয়েছে। জলধারণের কিছু জায়গা থাকে, যেমন ছোট পুকুর, নিচু জমি, লোকে এসব জায়গা ভরতি করে বাড়ি করেছে। আর রাস্তা থেকে অনেক উঁচু করে মানুষ তাদের বাড়ি, দোকানের প্লিন্থ বানিয়েছে। আর আছে বিয়েবাড়ি, নানা অনুষ্ঠানবাড়ির প্যাকেট, প্লাস্টিক-সহ সব বর্জ্য পদার্থ। এসব কিছু তারা নর্দমার মধ্যে ফেলে দেয়। সবসময় প্রশাসনের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। মানুষের এই বিষয়ে সচেতনতা দরকার— নিজের শহর নিজেদেরকেই পরিষ্কার রাখতে হবে, যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা যাবে না। নোংরা ফেলে ড্রেন বন্ধ করা যাবে না। এইসব কারণে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে ড্রেন বন্ধ হচ্ছে। এক সময় কোচবিহারে ৮৩টা পুকুর ছিল। কমতে কমতে সেটা ৩০/৩২টাতে এসে দাঁড়িয়েছে। জলধারণের জায়গাগুলো আর নেই। এদিকে মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমটা আমরা ভাল করার চেষ্টা করছি, যাতে কারও বাড়িতে জল না ওঠে, রাস্তায় জল না দাঁড়ায়। রাস্তায় জল জমলে তো রাস্তাও খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এসব বিষয় আমাদের মাথায় আছে। পুরসভার সঙ্গে, জেলাশাসকের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। এবার বর্ষায় রাজবাড়ির পুকুরের জল ওভারফ্লো হয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে। আবার বাজারের দিকের জলও ঢালু পেয়ে এদিকে এসে গিয়েছে। আর রাজবাড়ির সামনের রাস্তায় যে ড্রেন রয়েছে তা দিয়ে এই সম্পূর্ণ জল যাবার ক্ষমতা নেই।

প্রশ্ন- আপনার নিজস্ব কোচবিহার জেলার টুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কী প্ল্যান?

সরিৎমোহন ঘোষ, জলপাইগুড়ি

উত্তর- কোচবিহার জেলা রাজার শহর। অনেক পুরনো স্থাপত্য এখানে আছে। এখানে রাজবাড়ি থেকে শুরু করে সাগরদিঘি, মদনমোহন বাড়ি, বাণেশ্বরের শিব মন্দির, ধলুয়াবাড়ি সিদ্ধেশ্বরের শিব মন্দির, গোসানি মারি রাজপাটসহ বহু প্রাচীন স্থাপত্য রয়েছে। এগুলোকে সংস্কার করে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়ে এখানকার পুরাতন স্থাপত্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে, যাতে পর্যটকরা দেখতে আসে। ইতিমধ্যেই রাজবাড়িতে আমরা লালকেল্লার মতো 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' লাগানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এ ছাড়াও কিছু পার্ক, কিছু টুরিজম সেন্টার, কিছু পিকনিক প্লেস তৈরি করে বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিতে চাইছি। আগে মানুষ শুধু দার্জিলিঙের টানে পাহাড়ে বেড়াতে আসত। কার্শিয়াং, কালিম্পং দেখে ফিরে যেত এনজেপি হয়ে। কিন্তু এখন সবাই ডুয়ার্সেও বেড়াতে আসছে। তারা আলিপুর থেকে বেড়িয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হল, এদের সবাইকে কোচবিহারেও নিয়ে আসা। এভাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে টুরিস্টদের টানাও যাবে, তাতে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কিছু আয়ও হবে। এতে সকলেরই লাভ।

প্রশ্ন- বাম-শাসনের কথা ছেড়ে দিন। গত পাঁচ বছরে অনেক উন্নয়ন করেছেন আপনারা। পাহাড়ে তার ফল মিলেছে। কিন্তু ডুয়ার্স সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। নতুন টুরিস্ট কটেজ হয়েছে, কিন্তু ডুয়ার্সের পর্যটনের সার্বিক উন্নতি হয়নি। সমীক্ষা তা-ই বলছে। আপনি মানেন এই কথা?

বিপ্লব কুমার সরকার, জলপাইগুড়ি

উত্তর- আমি আপনার কথায় একমত হতে পারলাম না, কারণ পাঁচ বছর আগে যে টুরিস্ট আসত, তার তুলনায় এখন কয়েকশো গুণ বেড়েছে। এখন সিজনে টুরিস্টের ঢল নামে, রেকর্ড সংখ্যক টুরিস্ট আসে এখানে। এখন সারা বছরই অবশ্য আসে। প্রচুর টুরিস্ট লজ হয়েছে এবং জঙ্গলের রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে, রাস্তা অনেক মসৃণ হয়েছে। জঙ্গল ঘোরার জন্য সাফারির ব্যবস্থা আছে। হাতি সাফারিও আছে বন দপ্তরের তরফ থেকে। এবার উত্তরবঙ্গে নতুন ৮টি হাতি আসছে সাফারির জন্য। আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রকের পক্ষ থেকে রেল দপ্তরকে চিঠি দিয়েছিলাম এদিকে রেল পরিষেবা বাড়ানোর জন্য। তারা চিঠির উত্তরে জানিয়েছে, পুজোর আগেই পদাতিক এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার পর্যন্ত এক্সটেনশন করবে। পাশাপাশি যে যে ট্রেনে আমরা এক্সট্রা কোচ চেয়েছিলাম তা তারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে। পুজোর সময় যাতে পর্যটকরা বেশি করে আসতে পারে, তার জন্য অনেক বেশি করে স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল দপ্তর। আমি পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও কথা বলেছি, পুজোর আগেই যাতে ভলভো বাস কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি থেকে চালানো যায়। তাতে বেশি করে টুরিস্টরা আসতেও পারবে, আবার ফিরে যেতেও কোনও অসুবিধা হবে না। তিনি আমার এই দাবি মেনেও নিয়েছেন। কথা দিয়েছেন, পুজোর আগেই বেশ কিছু নতুন বাস,

ভলভো বাস এই রুটে দেবেন। বাম-আমলে টুরিজম ডিপার্টমেন্ট মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এই বিভাগের কী কাজ, সেটাই মানুষ জানত না। আগে লোকে যেমন ছুটি পেলেই উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত রওনা দিত, এখন কিন্তু সেই ট্রেন্ডটা বদলেছে। মানুষ আজ ডুয়ার্সমুখী হয়েছে। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই টুরিজমের উপর এত বেশি জোর দিয়েছেন, যার ফলেই এই পরিবর্তন।

প্রশ্ন- এয়ার সার্ভিস চালু না হওয়া পর্যন্ত বাগডোগরা-কোচবিহার হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু করলে ডুয়ার্স টুরিজম আর চাঙ্গা হত না? অক্টোবর থেকে মার্চ টেস্ট কেস হিসেবে দেখা যায় না?

সত্যব্রত রায়, আলিপুরদুয়ার ফোর্ট

উত্তর- সে ক্ষেত্রে বাগডোগরা থেকে কোচবিহার কমপক্ষে ২ থেকে ২৫ হাজার টাকা ভাড়া হবে। বাগডোগরা থেকে যারা শিলিগুড়ি যেতে চায়, তাদের আবার গাড়ি ভাড়া করে সেখানে আসতে হবে। এতে খরচ অনেক বেড়ে যাবে। এর আগে যখন এয়ার সার্ভিস চালু ছিল, তখন বাগডোগরায় আমরা স্টপেজ দিতাম, ভাড়া মাত্র ১৫০০ টাকা ছিল। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু কোনও যাত্রী পাইনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে, এই শর্ট রুটে হেলিকপ্টার সার্ভিসের সাকসেস হওয়াটা খুব কঠিন।
তবে এবার দুর্গা পুজো বা কালী পুজোর আগে কোচবিহার থেকে ৪২ সিটের উড়ান চালানোর কথা হচ্ছে। গত ১৫ তারিখের ক্যাবিনেট মিটিং-এ শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও এ নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছে। তার আগে কোচবিহারে ছোট ফ্লাইট চালানো হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু তাতে উঠতে মানুষ ভয় পাচ্ছে। তাই মাঝারি সাইজের বিমানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এয়ারপোর্ট লম্বা হয়ে গেলে তখন ৭০ সিটের উড়ান এখানে নামতে পারবে। বিমান চালু হলে শুধু কোচবিহার নয়, পার্শ্ববর্তী এলাকা ও নিম্ন আসামের মানুষও উপকৃত হবে।

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

দুর্গা দুর্গা

অবাক কাণ্ড। প্রতিবার নষ্ট হয়ে যেত সেই ঢাউস রেডিয়ো সেট। সাতের দশকের শেষ দিক। পুজোর ঠিক এক-দেড় মাস আগে ধরা পড়ত— রেডিয়ো বিকল! কী হবে এবার? তবে কি 'মহিষাসুরমর্দিনী' শোনা হবে না? বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এসে বসবেন না আমার গ্রামের বাড়ির উঠোনে? অনিন্দ্য সকাল নিয়ে আসবে না সেই স্বর্গীয় কণ্ঠগুলি— 'বাজল তোমার আলোর বেণু', 'জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা'....। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি বুঝতে পারবে না। সামনের পুকুরে-নালায় শাপলা-শালুক। টুপটাপ শিউলি পড়ে আছে। আমি কুড়াচ্ছি, দিদি কুড়াচ্ছে, আমার বাল্যবান্ধবী কুড়াচ্ছে।

সেই রেডিয়ো সেট চলে যেত দিনহাটা শহরে। যাঁর কাছে যেত, তাঁকে সেই ছোট্ট বয়সে বিশ্বকর্মাই মনে করতাম। তিনি আবার খুব ভাল হাওয়াইয়ান গিটার বাজান। অমল মজুমদার। ছোট্ট দোকানটা মহালয়ার আগে ভরে উঠত রেডিয়ো আর রেডিয়োতে। হাতে যন্ত্রপাতি নিয়ে টেবিলে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছেন সেই মানুষটি। আমাদের মতো আরও অনেকেরই রেডিয়ো সেট মহালয়ার আগেই বিকল হয়ে যেত।

মহালয়ার আর এক-দু'দিন বাকি, কিন্তু রেডিয়ো সেট আসছে না। সারা বাড়ি জুড়ে চাপা টেনশন। কারণ শুধু আমরা শুনব না তো, আশপাশের বাড়ির অনেকেই ভিড় করবেন আমাদের উঠোনে। বারান্দায় রাখা হবে রেডিয়োটি। টিভি নয়, তবু সে সময় সবাই তাকিয়ে থাকত রেডিয়ো সেটের দিকেই। 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠল...' যখনই সেই জলদগম্ভীর গলায় উচ্চারিত হত— সবার গায়ে কাঁটা দিত। সবকিছু চুপচাপ হয়ে যেত একটি কণ্ঠস্বরে।

প্রতিদিন দিনহাটায় অমলমামার কাছে এ যেত, সে যেত। বাবা-কাকা প্রতিবেশী। কিন্তু ফিরে বলতেন, হয়নি এখনও। ঠিক মহালয়ার আগের দিন দুপুরে মা যেতেন। আমরা অধীর অপেক্ষায় থাকতাম। বড় রাস্তার জাম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। একসময় দেখা যেত অনেক দূরে একটি রিকশা, আর দেবীর মতো মা বসে আছেন সিটে। তাঁর কোলে সেই কাঙ্ক্ষিত রেডিয়ো সেট। যত কাছে রিকশা এগিয়ে আসত, ততই আমাদের উল্লাস বাড়ত। কী যে ভালবাসায়, আদরে রেডিয়ো সেটটি টেবিলে বসানো হত!

পুজো এলে সেই রেডিয়ো সেটটি মিস করি বড্ড। কত পালটে গেল সব।

এখন তো শুধু ভাঙা কাচগুলো জোড়া লাগানোর প্রয়াস। এমন এক মহালয়ার আগে গয়েরকাটার জয় একদিন নিয়ে এল একটি বড় খাম। আমি বললাম, কী! সে বলল, খুলে দেখুন।

খাম খুলতেই অবাক। একটা বড় ফোটো। তার মেয়ের। তবে চেনা যাচ্ছে না। ছোট্ট মেয়েকে জয় দুর্গা সাজিয়েছে। ত্রিনয়ন বানিয়েছে। হাতে দিয়েছে ত্রিশূল। বলল, জানি আপনার ভাল লাগবে। আপনার তো অনেক যোগাযোগ। দেখবেন কোথাও ছাপা যায় কি না।

মহালয়ার আর এক-দু'দিন বাকি, কিন্তু রেডিয়ো সেট আসছে না। সারা বাড়ি জুড়ে চাপা টেনশন। কারণ শুধু আমরা শুনব না তো, আশপাশের বাড়ির অনেকেই ভিড় করবেন আমাদের উঠোনে। বারান্দায় রাখা হবে রেডিয়োটি। টিভি নয়, তবু সে সময় সবাই তাকিয়ে থাকত রেডিয়ো সেটের দিকেই। 'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠল...' যখনই সেই জলদগম্ভীর গলায় উচ্চারিত হত— সবার গায়ে কাঁটা দিত।

আমি যত্ন করে রাখলাম। কয়েক বছর পরেই তরতাজা জয়ের বুকে পেসমেকার বসল। তাকে দেখতে গেলাম এমনই এক শরৎ-শরৎ বিকেলে। সে হেসে বলল, ভাল আছি।

দেয়াল জুড়ে তখন তার দুর্গার সেই ফোটো। আমি সেইদিকে তাকিয়ে আছি। ও বলল, আপনাকে দিয়েছিলাম।

সেটাই জয়ের সঙ্গে শেষ দেখা। দুর্গার ফোটোটি থাকল। জয় চলে গেল চিরদিনের মতো।

জয়ের চলে যাওয়া অনেক কিছুই বদলে দিল। চা-বাগানের পুজোর আনন্দ অনেকটাই ফিকে হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল একটি অদ্ভুত মিষ্টি কাগজ 'মাতলো রে ভুবন'। পুজোর এক-দেড় মাস আগে চা-বাগান থেকে ওঁরা সবাই আসতেন। পুজোকে ঘিরে একটি কাগজ বার হবে। তা নিয়ে কত আবেগ। আমার দায়িত্ব পড়ত লেখাগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রেসে দেবার। আনকোরা অনেক লেখা। ঠিকঠাক করতে গিয়ে অনেক সময় পুরোটাই আমূল পালটে যেত! তাতে কোনও বছর কেউ কিচ্ছু মনে করতেন না। অঢেল স্বাধীনতায় কাটাকুটি করতাম। মহালয়ায় বেরত 'মাতলো রে ভুবন'। নাম ছাপা হবার আনন্দেই অনেকে আত্মহারা। সেই আনন্দটা আমাকেও কী যে ছুঁত! আমার পারিশ্রমিক ছিল বাগানের এক প্যাকেট চা-পাতা। পুরো শারদ দিন সেই চায়ে চুমুক দিতাম। জয়ের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগমনি সুর বিলীন হয়ে গেল।

একসময় ধূপগুড়িতে মহালয়ার সকালটা অন্যরকম হয়ে যেত একটি সম্প্রচারের কারণে। এটি দেখবার জন্য রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত। স্থানীয় কেব্‌ল নেটওয়ার্কের ছেলেদের হঠাৎই মাথায় এসেছিল, তারাও মহালয়া সম্প্রচার করবে। খোঁজ পড়ল এই অধমের। শুরু হল এক অন্য নির্মাণ। একটি ছোট্ট হ্যান্ডিক্যাম নিয়ে এক নির্মাণযুদ্ধ। গান তৈরি হল, ভাষ্য তৈরি হল, স্থানীয় মাইক সাপ্লাইয়ের লোকদের এনে তৈরি হল সাউন্ড স্টুডিয়ো। এলাকায় যাঁরা ভাল গান করেন, তাঁরা গান তুললেন।

তারপর এক কঠিন কাজ। দুর্গা খোঁজা। এই ছোট্ট শহরে রূপবতী দুর্গার দেখা পাওয়া দুষ্কর! যে আবার দেখতে সুন্দরী, সে অভিনয় জানে না, নাচ জানে না! একে ডেকে আনা হয়, ওকে ডেকে আনা হয়, কিন্তু পছন্দ আর হয় না। কেউ দেখতে রূপসি, কিন্তু দেবী-দেবী নয়! কেউ আবার দেবী-দেবী, কিন্তু অভিনয় জানে না! সে এক মহাসংকট। এদিকে মহালয়া এগিয়ে আসছে।

একদিন হঠাৎই তার দেখা মেলল। একটি গলি দিয়ে সে বেরিয়ে আসছে। একদম দুর্গা। সরু গলিটি আলো হয়ে উঠেছে। থেমে পড়ল সাইকেল। এক রূপসির দিকে তাকিয়ে পরিচালক! বাকিরা অবাক— লোকটার হল কী? স্বভাবচরিত্তির তো ভাল বলেই সবাই জানে! অথচ দিনদুপুরে এক মেয়ের দিকে তাকিয়ে গলির মোড়ে!

মেয়েটি পাত্তা দিল না। হনহন করে চলে গেল নিজের গন্তব্যে।

পরিচালক ছুটলেন কেব্‌ল-ছেলেদের কাছে। —খোঁজ নাও, ওই গলি থেকে আমার এবারের দুর্গা আজ হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়েছে!

অবশেষে তাকে পাওয়াও গেল। আসামের মেয়ে। জামাইবাবুর বাড়িতে আপাতত রয়েছে। নিয়ে আসা হল তাকে। কী মুশকিল, সে নাচ-অভিনয় কিছুই জানে না। পরিচালক নাছোড়বান্দা। —তোমাকে শিখে নিতে হবে। তোমাকে ছাড়া এবারের মহালয়া হবে না।

মেয়ে রাজি হল।

এবার শুটিং শুরু। আউটডোর। আমরা গেলাম পাঁপড়খেতি। ক্যামেরাম্যান গাড়ি থেকে নামতেই কানে কানে বলল, একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। নুন আনতে হত। এখানে প্রচণ্ড জোঁকের উপদ্রব।

আমি বললাম, কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। পরে দেখা যাবে!

পাহাড় বেয়ে নিচে নদীতে নামলাম আমরা। যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ। বড় বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে দুধসাদা স্রোত আর জলের আওয়াজে আত্মহারা সবাই। টেপরেকর্ডারে গান চালানো হল। আমাদের দুর্গা নাচছে। আমরা মুগ্ধ। মেয়েটি কত তৈরি করেছে নিজেকে এই ক'টা দিনের মধ্যে!

একসময় শুটিং শেষও হল।

আবার ওপরে ওঠা।

মেয়েটি দু'হাতে শাড়ি তুলেছে হাঁটু অবধি। আমি তার পিছনে, আমার পিছনে ক্যামেরাম্যান। সে আমায় খোঁচা দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আপনার দুর্গার পায়ের দিকে দেখুন।

চোখ নামালাম সেই ধবধবে ফরসা পায়ের দিকে।

সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। পায়ের নানান জায়গায় ঝুলছে কালো কালো জোঁক। গায়ে কাঁটা দিল।

উপরে ওঠবার পর বললাম, দাঁড়াও, জোঁকগুলো ফেলতে হবে।

নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় দুর্গা চরম আর্তনাদে লাফাতে লাগল। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তাকিয়ে দেখি আমাদের শরীরেও কিলবিল করছে জোঁক আর জোঁক!

পথিক বর

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

দেবীপক্ষে শুরু উল্কাদান দিয়ে শেষ

শারদ উৎসবের শুরু হয় মহালয়া দিয়ে। সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়, আর অমাবস্যা তিথিকে বলা হয় মহালয়া। আশ্বিনের এই অমাবস্যায় যথাবিহিত পারলৌকিক কর্মাদি সমাধা করে প্রতিপদ থেকে শুরু হয় দেবীপক্ষের আয়োজন।

এখন আলস্য মহাসাগরে ডুবে গিয়েছি, মহালয়ার ভোরবেলা আর ওঠা হয় না। কিন্তু স্কুলে কিংবা কলেজে পড়ার সময় আমরা বন্ধুরা মিলে মহালয়ার ভোরে বেরতাম সদলবলে। বাজিপটকার দমাদ্দম শব্দ ছাপিয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে গমগম করে ভেসে আসত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর 'মহিষাসুরমর্দিনী'। শারদ প্রাতে মেতে উঠত আমাদের নিজস্ব ভুবন। তখন দেখেছি, প্রচুর মানুষ তিস্তা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন হাঁটু-জলে। জলপাইগুড়ি শহরকে দু'ফাঁক করে বয়ে গিয়েছে যে শ্যামল ছায়া দিয়ে ঘেরা নদীটি, সেই করলার পাড়েও আসেন অনেকে, পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করতে।

শ্রাদ্ধ, তর্পণ— এসবে অনেকে বিশ্বাস করেন না। অনেকে আবার গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। ভোরবেলা যাঁরা এসেছেন তর্পণ করতে, তাঁরা স্থির বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন এখানে। উদাসভাবে বয়ে চলা এই নির্জন নদীর কূলে দাঁড়িয়ে তাঁরা হয়ত প্রশ্ন করেন চলে যাওয়া পিতৃপুরুষদের, আহ্বান করেন— তোমরা কোথায় চলে গিয়েছ? তাঁদের গত হয়ে যাওয়া পিতৃপুরুষরা হয়ত তাঁদের কানে কানে তিস্তাপাড় ছুঁয়ে যাওয়া বাতাসের মতো ফিসফিসিয়ে উত্তর দেন, আছি... আছি...। আমরা আছি তোমাদের নিবিড় স্মৃতিতে, আছি তোমাদের গহিন বেদনায়।

বিগ বাজেটের পুজো জলপাইগুড়িতে বেশ কিছু হয়। থিম পুজোর চলও শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হল। বহু বছর থেকেই দেখে আসছি তরুণ দল, পান্ডাপাড়া সর্বজনীন, দিশারীর মতো বড় পুজোগুলো বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচ করে পুজোর আয়োজন করে প্রতিবার। চন্দননগরের আলো, কৃষ্ণনগরের ঠাকুর, মেদিনীপুরের মণ্ডপসজ্জা— এমনই সব আকর্ষণ থাকে এসব পুজোয়। কদমতলা সর্বজনীন আবার জাতে কুলীন। বিরাট আটচালায় সেখানে প্রতিবার পূজিত হন টানা টানা চোখের ডাকের সাজের দুর্গা। নতুনপাড়ার আর-জি পার্টি আর মহুরিপাড়া সর্বজনীন নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে এসে থিম পুজো করে চমকে দেয় প্রতিবার। ইদানীং মোহিতনগর আর পাতকাটা কলোনি মেগাপুজো করে এসে পড়েছে এই তালিকায়। পুজোমণ্ডপে যত রাত বাড়ে, তত ভিড় বাড়তে থাকে উৎসাহী ছেলে-বুড়োর। তবে আমার মনে হয়, ঐতিহ্য আর পরম্পরার নিরিখে এই শহরের সেরা আকর্ষণ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম আর বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শান্ত-সমাহিত পরিবেশে মহাষষ্ঠীর দিন রামকৃষ্ণদেবের

সন্ধ্যারতির পর শুরু হয় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। সপ্তমীর সকালে নবপত্রিকা স্থাপন করে পুজোর সূচনা হয়। অষ্টমীর সকালে আশ্রমে কুমারী পুজো করা হয় ঘটা করে। তা দেখবার জন্য সারা শহর ছুটে আসে এখানে। যে শিশুটিকে কুমারী মনোনীত করা হয়, সে-ই সে বছর এই শহরের 'টক অব দ্য টাউন'। কেব্‌ল টিভিতে লাইভ দেখানো হয় সেই আচার-অনুষ্ঠান। সে দিন এই আশ্রম চত্বর নব্য যুবক-যুবতীদের ভিড়ে কাকভোর থেকে সরগরম। তাদের কলকাকলিতে কান পাতাই দায়। অনভ্যস্ত রঙিন তাঁতের শাড়িতে আর জমকালো ধুতি-পাঞ্জাবিতে সে দিন এখানে অলিখিত ভ্যালেন্টাইন'স ডে। অষ্টমীর সকালে কী যেন আছে। সে দিন ভ্রমরকালো চোখের ইশারায় আর কাচপোকা টিপের মারণ-উচাটনে বধ হয়ে যায় শয়ে শয়ে প্রেমিক তরুণ। নবমীর পুজো শেষে দেবীর হোম আর দশমীতে দর্পণে বিসর্জন শেষে রামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতির পর প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় আশ্রমে।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোর আবার অন্য মজা। এখানে সোনা-রুপোর অলংকারে সাজানো হয় মা-কে। মহালয়ার রাতে রাজবাড়ির মন্দিরে কালী পুজো হয়। প্রতিপদে সেই কালী মন্দিরেই স্থাপন করা হয় দুর্গা পুজোর ঘট। এই দিনই মায়ের চোখ আঁকা সম্পূর্ণ হয়। একচালার প্রতিমায় মা দুর্গার সঙ্গেই থাকেন জয়া, বিজয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর মহামায়া। সপ্তমীর রাতে হয় মায়ের বিশেষ পুজো। মাঝরাতে আটটি পায়রা বলি দেওয়া হয়। চালের গুঁড়ো দিয়ে পুতুল তৈরি করে বলি হয়। কথিত আছে, এখানে আগে নরবলি হত। প্রাচীনকালের নরবলির অনুকরণে এই রীতি এখনও পালিত হয়। অষ্টমীর দিন পাঁঠাবলি, পায়রা বলি হয়। নবমীতে হাঁস, পায়রা, আখ, চাল, কুমড়ো, লেবু বলি দেওয়া হয়। দশমীর দিন সিঁদুর খেলা শেষে দিনের বেলাতেই রাজবাড়ির পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয় মায়ের প্রতিমা। রাজবাড়ির সদস্যরা কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও এই সময় ফিরে আসেন ঘরে। উৎসবমুখর হয় রাজবাড়ি, নতুন করে জ্বলে ওঠে ঝাড়লণ্ঠন। রাজপরিবারের পুজো হলেও সারা শহরের লোক উপচে পড়ে এখানে। সবার অংশগ্রহণে এই উৎসব সর্বজনীন রূপ নেয়।

প্রতি বছর সেই একই আয়োজন। দেখে দেখে মাথায় গেঁথে গিয়েছে সব। তবুও তৃষ্ণা মেটে না। ফি-বছর সপ্তমী থেকে দশমীর দুপুরগুলো কাটে এখানেই। চিরচেনা দৃশ্যগুলো জলছবির মতো লুকিয়ে থাকে

এ সময় তারা প্রায় সবাই ফিরে আসে নিজ শহরে। আবার রি-ইউনিয়ন হয় আমাদের। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের চাতালে কিংবা রাজবাড়ির আঙিনায় চাঁদোয়ার তলে বসে আমরা স্মৃতির ঘ্রাণ নিই। বিজয়া দশমীর সন্ধেবেলা বাবুঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলে এখনও শ্বাস ভারী হয়ে আসে। একটা আবছা কষ্ট হয় বুকের ভেতর।

বুকের ভিতর। পুজোর সময় আবার ধুলো ঝেড়ে সেই ছবিগুলো ফিরে ফিরে দেখি।

যখন স্কুলে পড়তাম, তখনও আশ্রমের আর রাজবাড়ির পুজো দেখতে আসতাম বন্ধুদের সঙ্গে। এখন বেশির ভাগ বন্ধুই এখানে-ওখানে ছিটকে গিয়েছে কর্মসূত্রে। কিন্তু এ সময় তারা প্রায় সবাই ফিরে আসে নিজ শহরে। রিইউনিয়ন হয় আমাদের। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের চাতালে কিংবা রাজবাড়ির আঙিনায় চাঁদোয়ার তলে বসে আমরা স্মৃতির ঘ্রাণ নিই। বিজয়াদশমীর সন্ধেবেলা বাবুঘাটে প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলে এখনও শ্বাস ভারী হয়ে আসে। একটা আবছা কষ্ট হয় বুকের ভিতর। গলার কাছটায় ডেলা পাকিয়ে ওঠে আজও।

আমাদের পিতৃপুরুষরা যমলোক থেকে মর্তলোকে নেমে আসেন মহালয়ার প্রত্যূষে। তাঁরা আবার যমলোকে প্রস্থান করবেন ভূতচতুর্দশীতে, দীপান্বিতার রাতে। শাস্ত্রের বিধান— মহালয়ার দিন পার্বণ-শ্রাদ্ধ করা উচিত। কোনও কারণে না পারলে দীপান্বিতার দিন করতেই হবে। এর পর উল্কাদান। ঠিক যেন কোনও চিত্রকল্প। অনুপম কবিতার মতো। আমাদের পিতৃপুরুষরা ফিরে চলেছেন অনন্ত অন্ধকার পথে যমলোকে। নভশ্চর উল্কা সেই পথ আলোকিত করছে। উল্কার আকৃতি কিছুটা মশালের মতো। দীপান্বিতার রাতে দীপদান উল্কাদানেরই প্রতীক। পুরাণকারের কী অসাধারণ কল্পনা! তারা নয়, উল্কার আলোয় পথ চিনে চিনে ফিরে চলেছেন ছায়াশরীরধারী সেই তাঁরা, যাঁরা একসময় এই পৃথিবীর হাসিকান্নার শরিক ছিলেন।

সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে যে উৎসবের সূচনা, তার সমাপ্তি ঘটে এই সময়টাতেই। আমাদের হৃদয়ের তাপে স্পন্দিত ডুয়ার্সের বর্ণিল শারদ উৎসব এমন কাবিক্য পরিসমাপ্তিই বুঝি দাবি করে!

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

ডুয়ার্সের সেরা পুজোর আগাম হদিশ

আশপাশের শিল্পীরা। চন্দননগরের আলো যে সেখানকার শিল্পীরা ছাড়া অন্য শিল্পীরাও করতে পারেন, সেটা তুলে ধরাই এঁদের উদ্দেশ্য। আলো করেছেন গণেশ দাস। মণ্ডপসজ্জায় ধূপগুড়ির বিশ্বজিৎ সাহা এবং প্রতিমা বানাচ্ছেন জলপাইগুড়ির ‘রূপ ভারতী’র শিল্পীরা। মণ্ডপটি কাল্পনিক। তৈরি হচ্ছে বাঁশ, বেত এবং উপেক্ষিত ডালপালা দিয়ে। প্রতিমাও এবারে একটু অন্যরকম। মা আসছেন কৈলাস থেকে, গ্রাম্য বধূর বেশে। তাই মা দ্বিভুজা। মাঝপথে অসুরের সঙ্গে দেখা এবং কার্তিক ও সিংহের সঙ্গে অসুরের লড়াই। অষ্টমীর রাতে থাকবে মহাভোজ। তা ছাড়া প্রতিদিন সন্ধেয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাজেট ৮ লক্ষ।

জলপাইগুড়ির পুজো

জলপাইগুড়িতে দুর্গা পুজোর আকর্ষণ আজকাল যথেষ্ট বেশি। তরুণদল, দিশারী, পাতকাটার দুটো বড় পুজো মিলে বেশ হইচই ব্যাপার। আছে মালবাজার, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ির বড় পুজোও। চলুন, কে কী বানাতে যাচ্ছেন একটু ঘুরে দেখা যাক।

তরুণদল, জলপাইগুড়ি

এবারের আকর্ষণ প্যারিসের অপেরা হাউসের আদলে মণ্ডপ। মণ্ডপটি সাজানো হবে কাচ, বিভিন্ন ধরনের বীজ এবং হরীতকী দিয়ে। আলোর সাতখানা গেট থাকবে। নবদ্বীপ থেকে আসছেন শিল্পীরা। এ বছরের বাজেট ১১ লাখের আশপাশে। ক্লাবের সারা বছরের বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি পুজোর সময়ও উদ্‌বোধনের দিন দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং আর্থিক সাহায্যও তুলে দেওয়া হয়, এবারেও সেরকম পরিকল্পনা রাখা আছে। প্রতি বছর যে বিপুল জনসমাগম হয়, এবারেও আশা করা যাচ্ছে, তেমনটাই হবে।

দিশারী, জলপাইগুড়ি

দিশারী এ বছর একটি সাবেকি কাল্পনিক মণ্ডপ করবে। আকর্ষণ থাকবে মণ্ডপসজ্জায়। মণ্ডপ সাজানো হবে হোগলা পাতার কারুকার্য দিয়ে। মণ্ডপটি বানাবে সুরুচি ডেকরেটর, নবদ্বীপ। প্রতিমা বানাচ্ছেন নবদ্বীপের গৌতম সাহা, আর থাকছে নেহা ইলেকট্রিক্যালসের লাইট। পুজোর তিন দিন থাকছে দরিদ্রনারায়ণ সেবা অর্থাৎ ভোগ বিতরণ এবং দুঃস্থ ও পড়াশোনায় আগ্রহী ছেলেমেয়েদের আর্থিক সাহায্য। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সব মিলিয়ে এবারের বাজেট ১২ লাখ।

পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার, জলপাইগুড়ি

এবারে ৫৮তম বর্ষে পদার্পণ। প্রতি বছরই বাইরে থেকে শিল্পীদের আনিয়ে মণ্ডপ এবং প্রতিমার কাজ করানো হত। কিন্তু এবার তাঁরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করেছেন। ইদানীংকালের প্রতিযোগিতার বাজারে স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ না দিলে তাঁরা তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর অভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবেন। তাই কিছুটা এই দায়িত্ব নিয়েই বলা যেতে পারে, এঁদের পুজোয় এবার সকলেই নিজেদের শহরের

অগ্রণী সংঘ, পাতকাটা, জলপাইগুড়ি

দক্ষিণের চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের আদলে হবে এবারের মণ্ডপ। বাজেট ৮ লক্ষ টাকা। মণ্ডপটির বাইরে এবং ভিতরে সাজানো হচ্ছে ‘কানাইডিঙা’ ফল আর ঝিনুক দিয়ে। মণ্ডপসজ্জায় আছেন কোচবিহারের পাতলাখাওয়ার লক্ষ্মণ বর্মন। থাকছে জলপাইগুড়ির জীবন পালের তৈরি প্রতিমা। প্রতি বছর অষ্টমীতে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পঞ্চমীতে দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ। এ ছাড়াও দুঃস্থ এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। প্রতিবারের মতো এবারেও থাকছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মাল কলোনি সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি, মালবাজার

এ পুজোতে সাবেকিয়ানাই প্রধান। একচালায় ডাকের সাজের প্রতিমা, কাল্পনিক মন্দির, অষ্টমীতে ভোগ বিতরণ— সবটাতেই থাকছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া। দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের পথে থাকছে বিশেষ আকর্ষণ, মুর্শিদাবাদ থেকে ১৫ জনের একটি দল আসছেন, যাঁরা রণপা পরে ঘাটে যাওয়ার পথকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন।

তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। মিশন নির্মল বাংলা নিয়ে কাজ চলছে যথাযথ সাফল্যের সঙ্গে। সমিতির জেনারেল ফান্ডের মাধ্যমে রসিক বিলকে সাজানো হয়েছে, যাতে পর্যটকরা এখানে আরও বেশি করে আসেন। এখানে সব ক'টা পুজো যেন সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও পুজো প্যান্ডেলগুলিতে মিশন নির্মল বাংলার ব্যানার থাকবে যাতে প্রত্যেকটি মানুষ এব্যাপারে সচেতন হয়।

তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে দুর্গা ও কালীপুজোর আগাম শুভেচ্ছা রইল সকল পল্লীবাসীর কাছে।

মথিয়াচ লেপচা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি
বক্সিরহাট, কোচবিহার

স্বপন কুমার সাহা
সভাপতি
যোগেশ চন্দ্র রায়
সহকারী সভাপতি
তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতি
বক্সিরহাট, কোচবিহার

বাজেট ৫ লাখ।

সানরাইজ ক্লাব, ময়নাগুড়ি

মণ্ডপটি একটি রথ। ভাবনা, রথের মেলা। পুরো মণ্ডপটি পুতুল দিয়ে সাজাচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের শিল্পীরা। আর থাকছে চন্দননগরের আলো। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও অষ্টমীর দিন দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র দান করা হবে এবং নবমীতে কৃতী ছেলেমেয়েদের প্রদান করা হবে অর্থ। এ বছর ৪৬ বছরে পা দিল ময়নাগুড়ি সানরাইজ ক্লাব। বাজেট ১২ লাখ।

ধূপগুড়ি দক্ষিণায়ন ক্লাব

১২ লক্ষ টাকার বাজেটে এবারে থাকছে ধূপগুড়ির শিল্পীর প্রতিমা। কাল্পনিক মণ্ডপটি তৈরি করবেন নবদ্বীপের শিল্পীরা। দু'দিন ধরে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছর অষ্টমীর দিন প্রায় হাজার দুয়েক মানুষের ঢল নেমে যায় মণ্ডপে। সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এবারেও তা-ই হবে আশা রাখেন তাঁরা। গত বছর থেকে একটি মেলার আয়োজন শুরু হয়েছে। যেহেতু প্রথমবার ছিল, তাই ঠিকঠাক মনোমতো হয়নি। এবারে বসবে 'আনন্দমেলা'। নাগরদোলাসহ বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থায় ভরপুর।

সামসিং জনকল্যাণ সমিতি জংশন লাইন দুর্গা পূজা কমিটি, মালবাজার

চা-বাগানের মধ্যে একটাই মাত্র পুজোকে ঘিরে আনন্দ করে সকলে, এরকমই চলে আসছে। আনন্দ আর আন্তরিকতা— দুটোই এখানে অনেক বেশি থাকে শহরাঞ্চলের বড় বড় বাজেটের পুজোর চাইতে।

লুকশান কালচারাল অ্যান্ড স্পোর্টিং ক্লাব, নাগরাকাটা

পুজো মানেই বিশাল আকারের মণ্ডপ নয়, পুজো মানে কিছু কাজ করাও। এইকথা মাথায় রেখেই এই ক্লাবের সদস্যরা ভাবছেন, থিম হিসেবে এবারে রাখবেন 'নির্মল বাংলা' কনসেপ্ট। পুজোর কয়েকদিন চলবে এই বিষয়ের উপর কাজ। প্রতি বছরের মতো এবারেও থাকবে অষ্টমীর দিন মহাভোজের আয়োজন। এখানে লোকসংখ্যার তেমন আধিক্য না থাকায় এলাকার মানুষরা পরিবারের সকলকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকেন পুজোর ক'টা দিন।

শ্বেতা সরখেল

আলিপুরদুয়ারের পুজো

তখন জঙ্গলে ঘেরা এলাকা, বাঙালিদের বসবাস নেই বললেই চলে। মেচিয়া উপজাতির বসবাস। জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার বুক চিরে বয়ে গিয়েছে তিস্তা, তোর্সা, রায়ডাক ও কালজানি নদী। রয়েছে কিছু খ্রিস্টান মিশনারি। পূর্ববাংলার রংপুর জেলা থেকে বাঙালিরা, মূলত মুসলিম ব্যাপারীরা আসে এই এলাকায় সওদাগরি করতে। কেউ আসে হেঁটে, আবার কেউ বা গোরুর গাড়িতে বামনহাট হয়ে। ধীরে ধীরে কিছু বাঙালি হিন্দু সওদাগর পাকাপাকিভাবে এখানে থাকতে শুরু করল। গড়ে উঠল 'সওদাগর পট্টি'। তখন ১৮৯৮-৯৯ সাল। আর সে দিনের সেই জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকাই হল ইংরেজদের উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশের আঠারোটি দ্বার বা দুয়ারের মধ্যে অন্যতম আলিপুরদুয়ার।

সে সময় অর্থাৎ ১৮৯৮ সাল নাগাদ আদিম উপজাতি মেচিয়া, গাড়ো ও রাভাপ্রধান এলাকা ছিল আলিপুরদুয়ার। মেচিয়ারা বহু আগেই আসে প্রথম ইন্দো-ভুটান যুদ্ধের পর। ১৮৬৫ সাল নাগাদ 'পুশ ফ্যাক্টর' ও 'পুল ফ্যাক্টর'-এর কারণে ইংরেজ রাজের প্রয়োজনে ভুটানপাড়া পার করে আসে গাড়ো ও রাভারা। তখনও চা-বাগান গড়ে ওঠেনি। আলিপুরদুয়ারের প্রথম চা-বাগান 'কালীপুর টি এস্টেট'। ধীরে ধীরে বাবুসমাজের নজরে আসে ডুয়ার্সের এই অঞ্চল। কোলকেতে বাবুরা বহু বাগান গড়ে তোলেন। বাড়ে লোকসংখ্যা। ১৯০০ সালে চালু হল রেলব্যবস্থা। ফলে পূর্ববাংলা থেকে আরও বেশি সংখ্যায় সওদাগরের আসা-যাওয়া বাড়ে সওদাগর পট্টিকে ঘিরে। এখানেই ১৯০০ সালে গড়ে ওঠে টিনের চালায় দুর্গাবাড়ি। আর ওই বছরই আলিপুরদুয়ারে হয় প্রথম দুর্গা পুজো। আজ এটি দালানবাড়ি এবং পরিচিত 'আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি' নামে। এটি আজ আলিপুরদুয়ারের হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মক্ষেত্রও বটে।

সাল ১৯৪৭। দেশ স্বাধীনতা পেল, কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হল। ওপার বাংলা থেকে জনস্রোত আছড়ে পড়ল বাংলায়। আলিপুরদুয়ারেও এর ঢেউ উঠল। একে একে গড়ে উঠল সূর্যনগর, মিলনপল্লি, কালীবাড়ি, অরবিন্দনগর, সুতলিপট্টি, নিউটাউন। ১৯৪৯ সালে গড়ে উঠল আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে জংশন। ফলে জনবসতি আরও বাড়ল। রেল কলোনি, চা-বাগান, বন বিভাগের কর্মীবর্গ, আদিবাসী সমাজ এবং ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের নিয়ে বেড়ে চলে আলিপুরদুয়ার। ধীরে ধীরে জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম মহকুমা হিসেবে আলিপুরদুয়ার সমৃদ্ধি পায়। শিক্ষা-অর্থনীতিতে এগিয়ে আলিপুরদুয়ারে অবশেষে আওয়াজ ওঠে জেলার দাবিতে।

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের কুড়িতম জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল আলিপুরদুয়ার। দিনটি ছিল ২৫ জুন, ২০১৪ সাল। উদ্‌বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা, বীরপাড়া, কালচিনি ও জয়গাঁও ব্লক নিয়ে গঠিত আলিপুরদুয়ার জেলা। তবে জেলা সদর আলিপুরদুয়ার চা-বাগান, জঙ্গল ও প্রকৃতি ঘেরা এক সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল। এখন শরৎকাল। সমাগত শারদ উৎসব। সেজে উঠছে ছোট-বড় কুড়িটি দুর্গামণ্ডপ। যেমন আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি, উপল মুখর, মিলন সংঘ, নেতাজি রোড দুর্গাবাড়ি, ভ্রাতৃ সংঘ, কোর্ট বয়েজ ক্লাব, সূর্যনগর ক্লাব, বিবেকানন্দ ক্লাব, স্টেশন রোড, অরবিন্দ ক্লাব, কিশোর সংঘ, হোয়াইট হাউজ ইত্যাদি।

আলিপুরদুয়ারের প্রথম পুজো 'আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি'র পুজো। আর প্রথম বাড়ির বা গৃহস্থের পুজো দ্বারকানাথ সাহাবাড়ির পুজো। আজ সাহাদের পুজো শতবর্ষ অতিক্রান্ত। ১০১ বছরের পুজো এবার। উত্তরের অন্যতম লেখক এবং আলিপুরদুয়ারের জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি রমেন দে-র অভিমত হল, 'বাংলাদেশি সওদাগররা ১৮৯৮ সাল থেকে সওদাগর পট্টিতে দু'-এক পরিবার করে থাকতে শুরু করেন, এবং ১৯০০ সালে তাঁরাই দুর্গাবাড়ি তৈরি করে প্রথম দুর্গা পুজো করেন আলিপুরদুয়ারে। তবে সাহাদের পুজো এখানে ১০০ বছর হয়নি, কেননা তাঁরা বাংলাদেশের পুজোর সময়কালকে যোগ করেই শতবর্ষ পালন করেছেন। তবে এটিই প্রথম বাড়ির পুজো।' আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা ও পেশায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'পুজোর ক'টি দিন চা-বলয় থেকে প্রচুর লোক ভিড় জমায় মণ্ডপগুলোতে। ওরা দিনেই আসে। কেনাকাটা করে, শহর ঘুরে সন্ধ্যায় মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করে রাতশেষে বাড়ি ফেরে।' তবে এবার চা-বাগানগুলোয় এখনও বোনাস ঘোষণা না করায় চা-বলয়ে বিশ্বকর্মা

পুজো পার করেও শারদ উৎসবের কোনও আঁচ এসে পৌঁছায়নি। ফুলমণি, ঝগরু, দোহারিয়া জানেন না তাঁদের বাচ্চাদের গায়ে নতুন পোশাক উঠবে কি না। টি-বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান, ঘরের ছেলে বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী অবশ্য উদ্যোগী হয়েছেন এ ব্যাপারে। তিনি আশাবাদী। পুজোর কর্মকর্তারাও এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। কারণ চা-বলয়ের মানুষ ছাড়া আলিপুরদুয়ারের মণ্ডপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায় না। নতুন নতুন পসরা-পোশাক সাজিয়ে নিয়ে বসা ব্যবসায়ীদের মুখও ভার।

তবে পুজোর ক'টা দিন যাতে নির্বিঘ্নে কাটে, মানুষ আনন্দে মেতে উঠতে পারে এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে— এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। ট্রাফিক ব্যবস্থা, পুলিশ কনট্রোল রুম, যানজট নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা এক প্রকার তৈরি। আলিপুরদুয়ারের মহকুমাশাসক সমীরণ মণ্ডল জানান, 'কুড়িটি ক্লাবের কর্মকর্তাদের নিয়ে ১৬.০৯.২০১৬-তে প্রশাসনিক বৈঠক সুসম্পন্ন হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও জঙ্গি হানা বা থ্রেটের কোনও খবর নেই। শারদ উৎসব আশা করছি সানন্দেই সম্পন্ন হবে।' মহকুমাশাসক আরও জানান, 'এবার পুজোর কর্মকর্তারা অনুমোদনের জন্য অনলাইন আবেদন করতে পারবেন এবং এতে তাঁদের হয়রানি কমবে, ভালোভাবে পুজোটা করতে পারবেন।'

আলিপুরদুয়ারের পুজোর আজও মূল আকর্ষণ প্রাচীন পুজো দুর্গাবাড়ির পুজোকে ঘিরে। এখানে মা সন্তানদের নিয়ে এক কাঠামোয় বিচরণ করেন। প্রবীণদের ভিড় এখানে লক্ষণীয়। মহাষ্টমীর অঞ্জলিতে এই মণ্ডপে ভিড় উপচে পড়ে। অন্যান্য পুজোর মধ্যে উল্লেখ্য হল উপল মুখর দুর্গামণ্ডপ। পুজো কমিটির সম্পাদক বিষ্ণু ভৌমিক জানান, 'উপল মুখরের পুজো এবার ৬৮ বছরে। থিম কাল্পনিক এবং মণ্ডপ সাজছে লাউ-কুমড়াসহ বিভিন্ন ফলের বীজ দিয়ে। আলোকসজ্জায় চন্দননগর এবং প্রতিমাশিল্পী শোভাগঞ্জের গোপাল পাল।' তাঁদের পুজো অন্যান্যবারের মতোই ভিড় টানবে বলে আশাবাদী বিষ্ণুবাবু। ভ্রাতৃ সংঘর আলোকসজ্জা বরাবর দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এবারেও তাঁরা প্রকৃতি ও শিশুদের মনোরঞ্জনের বিভিন্ন বিষয় আলোকমালায় তুলে ধরবেন। স্টেশনপাড়ার পুজোও আলিপুরদুয়ারের অন্যতম পুজো। তাঁদের থিম কাল্পনিক। তাঁরাও ভিড় টানার বিষয়ে আশা রাখছেন। হোয়াইট হাউজের পুজো আলিপুরদুয়ারের সেরা পুজোগুলোর মধ্যে জায়গা ধরে রেখেছে বহু বছর যাবৎ। পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা শ্যামল সাহা জানান, 'আমাদের পুজো এবার ৩৫ বছরে পা রাখল। প্রতিমা আসছে বরাবরের মতোই কলকাতার কুমারটুলি থেকে।' হোগলাপাতায় সেজে উঠছে হোয়াইট হাউজের বিশাল মাতৃমণ্ডপ। মিলন সংঘর পুজোও অন্যতম পুজো। চন্দননগরের আলোকসজ্জার পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জায় তাঁরা চমক দিতে চলেছেন, আগে আগেই থিম বলতে নারাজ কর্মকর্তারা।

আলিপুরদুয়ারের পুজোর আঙিনায় সাহিত্য আসর অন্যতম। রমেন দে-র 'ডুয়ার্স বার্তা', বিপ্রদীপ ঘোষদের লিটল ম্যাগাজিন যথেষ্ট সাহিত্যরসসমৃদ্ধ। প্রায় প্রতিটি ক্লাবই পুজোয় প্রকাশ করে স্মরণিকা। লেখক ও শিক্ষক বিপ্রদীপ, ভাস্কর মজুমদার, বিনয় সরকাররা এখন পুরোপুরি ব্যস্ত তাঁদের লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় কালো অক্ষরের রাশিতে মানুষের সুখ-দুঃখের কথা তুলে আনতে।

আলিপুরদুয়ারের পুজো জৌলুস হারিয়েছে। ব্যবসা মার খাচ্ছে। গুটিকয়েক কাপড়ের দোকান ছাড়া সেভাবে বিক্রি নেই কারওই। তবে বাগান মালিকরা বোনাসটা দিয়ে দিলে বাজার ও পুজো কিছুটা হলেও জমে উঠবে। জানা গিয়েছে, বাগান মালিকরা ১৯ শতাংশ বোনাস দিতে চলেছেন কর্মীদের। ফলে বলা যেতেই পারে, আলিপুরদুয়ারের পুজো ২০১৬ সালেও ফিরতে চলেছে স্বমহিমায়।

দিব্যেন্দু ভৌমিক

মথুরা বাগানের পুজো আজও একইরকম জমজমাট

শহর নগরের মানুষ আজকাল অত্যাধিক জাঁকজমকে ভরা দুর্গাপুজো দেখতেই অভ্যস্ত। তবে তার মধ্যেই অনেকে আজকাল বলেন, ‘উফফফ্, পুজোর কটা দিন কাটলে বাঁচি’ অথবা ‘আমরা তো আজকাল পুজোতে বাইরে গিয়ে একটু নিরিবিলিতে পুজোর দিন কটা কাটিয়ে আসি। এত হইচই একদম ভাল লাগে না’। কেউ বা বলেন ‘আগেকার দিনের সেই আন্তরিকতা গায়েব হয়ে কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর টুকুই বেঁচে আছে। জগন্মাতা পুজো নেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ। দুর্গাপুজোর সেই প্রাণ খুঁজে পাই না’।

তা, আপনিও যদি এমনই ভেবে উত্তরবঙ্গে এসে পৌঁছান এবং কোথায় গেলে সবুজ প্রকৃতির কোলে দু’দন্ড শান্তিতে বসে পুজো দেখব ভেবে অধীর হন, তবে আসতে হবে ‘মথুরা চা বাগানে’। সেখানকার অধিবাসী ও আদিবাসীরা সেই চিরাচরিত পুজোর রীতি মেনে আগমনীর সুরে আজও প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করে চলেছেন। সেখানকার সাদাসিধে পুজোমন্ডপে সম্পদের চোখধাঁধানো জেল্লা না থাকলেও আছে আন্তরিকতার অঢেল ছোঁয়া। বলিহারি থিমের নিত্য নতুন আইডিয়া খুঁজে না পেলেও পাওয়া যাবে যত্নের আবহে সাজানো সপরিবার দুর্গামাতৃকা।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের প্রায় মাঝ বরাবর রয়েছে এই মথুরা চা-বাগান। চিলাপাতা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গা ঘেঁষেই। আলিপুরদুয়ার থেকে মথুরা চা বাগানের দূরত্ব মাত্র ১৬ কিলোমিটার আর কোচবিহার থেকে তিরিশ। সোনাপুর চৌপথিতে পৌঁছে প্রথমে বাঁ দিকে ও পরে ডাইনে বাঁক নিয়ে চিলাপাতা সংরক্ষিত অরণ্যের দিকে গাড়ি নিয়ে মিনিট দশেক গেলেই মথুরা চা-বাগানের প্রবেশ পথটি চোখে পড়বে। সেই রাস্তা ধরে সোজা নাক বরাবর এগিয়ে গেলেই পুজো মন্ডপ, যেখানে দুর্গাপুজোর মতো এক বিরাট কার্মকাণ্ড হয়ে চলেছে পাঁচদিন ধরে।

যে চা-বাগানের পুজোর কথা বলতে বসেছি, তার নাম মথুরা চা-বাগান। আগে মথুরা বাগান ছিল চিলাপাতা ফরেস্ট রেঞ্জেরই অংশ। অবশ্য তারপরে এই বাগান এসেছিল বাঙালি মালিকের হাতে। প্রথমে তারিনী প্রসাদ রায় ও পরে এস পি রায় ছিলেন এর কর্ণধার। ১৮৯৮ সালে প্রথম এখানে চা গাছ লাগান শুরু হয় অর্থাৎ

রূপসি ডুয়ার্স

পুজোর সাজ ২

টিপ্‌স দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান **মালা দাস**

চারদিকে সাজ সাজ রব। মাকে নানা রঙে, নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হচ্ছে। মায়ের আগমনের জন্য দিন গুনছি আমরা। সকলেই সাজসজ্জা নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা করছেন। পোশাক, ব্যাগ, জুতো, নানা ধরনের গয়না, কেনাকাটার শেষ পর্যায় চলছে, তাই সবাই ব্যস্ত। পুজো মানেই আনন্দ আর খুশিতে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়া। ঢাকের তালে তালে মনে জাগে আনন্দ। এই আনন্দের মুহূর্তে সুন্দর করে নিজেকে সাজাতে হবে— এই নিয়ে নানা পরিকল্পনা চলছে। মাকে আহ্বান জানাতে পাঁচ দিন আলাদা আলাদাভাবে সাজতে হবে।

ষষ্ঠীর দিন সকালে মাকে আহ্বান করতে হালকা ধরনের পোশাক পরুন এবং হালকা মুজ আর লাইনার লাগান।

সপ্তমীর দিন সকালেও হালকা সাজেই সাজুন, আর রাতে একটু জমকালো সাজে সাজতে পারেন— ফাউন্ডেশন, কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক, ব্লাশার লাগাতে পারেন। চুল কাটা থাকলে সেই স্টাইলকেই মেন্টেইন করুন।

অষ্টমীর দিন সকালটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ সকাল, কারণ আমরা সকলেই মন্ত্রের মাধ্যমে মাকে অঞ্জলি দিয়ে মায়ের বিশেষ কৃপা পেতে চাই— তাই আমাদের সাজেও একটা বিশেষ ধরন থাকে। সে দিন লালপেড়ে সাদা শাড়ি বা লাল রঙের শাড়ি পরলে ভাল লাগে। চুলে এলোখোঁপা বাঁধতে পারেন। হালকা মেকআপ করতে পারেন, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক লাগান, চোখে দিন লাইনার। এই সময় সোনার গয়না ভাল লাগে। রুপোলি গয়নাও পাওয়া যায়। অষ্টমীর রাতে সকলেই বিশেষ কালেকশন করা শাড়ি বা ড্রেস পরে থাকেন। তাই মেকওভারটাও বিশেষ হওয়া দরকার। ফাউন্ডেশন, হাইলাইটার, ব্লাশার, লিপলাইন, লিপস্টিক, আইশ্যাডো ও লাইনার লাগান। তবে চোখ ও ঠোঁট একসঙ্গে হাইলাইট করবেন না। আর আইশ্যাডোর সঙ্গে ব্লাশারের রং যেন একরকম না হয়। চুলে নানা ধরনের স্টাইল করতে পারেন। যেমন— Iron, Tong, Crimping করতে পারেন। নানা ধরনের খোঁপা বাঁধতে পারেন।

নবমীর দিন সকালে ও সন্ধ্যায় নতুন সাজে সাজতে ভুলবেন না। জুতোটায় একটু হিল থাকলে ভাল হয়, কারণ তাতে হাঁটাচলায় আলাদা ছন্দ আসে। সুগন্ধি (সেন্ট বা বডি স্প্রে) ব্যবহার করতে ভুলবেন না। সুগন্ধি আপনার ব্যক্তিত্বের একটা বড় জাদুকাঠি।

ক'দিন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবশ্য শুধু ক্লান্তি নয়, মাকে বিদায় দিতে হবে ভেবেই সকলের মন বিষাদে ভরে যায়। তাই সাজসজ্জাতেও থাকে ঢিলেঢালা ভাব।

দশমীর দিন ভারাক্রান্ত মনে সিঁদুর, মিষ্টি, পান দিয়ে মাকে আবার আসার আমন্ত্রণ জানাতে মহিলাদের ঢল নামে। মায়ের চরণ ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে মহিলারা সকলে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এই সিঁদুরের ছোঁয়াতে সকলে হয়ে ওঠেন রঙিন, তার সঙ্গে থাকে মায়ের কাছে প্রার্থনা—মা, তুমি আবার এসো।

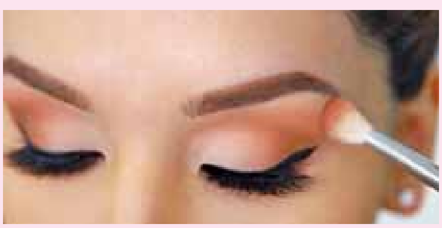

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

একশো বসন্ত পার করে এসেছে এ বাগানের ইতিহাস। এরও পরে ১৯১৮ সালে বাগানটি সারদা টি কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্ত হয়। সেও প্রায় আটানব্বই বছর পার হয়ে গেল। ক্রমে সময়ের অমোঘ স্রোতে বাগানের মালিকানায় আরও হাত বদল হয়। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধুনা প্রখ্যাত বাণিজ্যাধিকারী কোম্পানি ম্যাকলিয়ড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড বাগানটি ক্রয় করে নেয়। সেই অবধি সকল কর্মচারী ও আধিকারীকদের একনিষ্ঠ সহযোগিতায় বাগানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে ও সার্বিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে বাৎসরিক দুর্গাপুজোর ধারাটিও বয়ে চলেছে।

বরিষ্ঠ করণিক মিহির ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে জেনেছিলাম এই বাগানে দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। তখন পুজো হত সহকারী ম্যানেজার স্বর্গীয় হেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্যের কোয়ার্টার্সে। বছর চারেক পরে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুজো হয় কী না হয় এমন উপক্রম হওয়ায় কর্মীদের উদ্যোগে শুরু হয় এই সার্বজনীন দুর্গাপুজো। পাকাপাকি পুজোমন্ডপ তৈরি হয় ১৯৬৩ সালে। সেই থেকে পুজো মন্ডপেই হয়ে আসছে।

দুর্গাপুজোটি প্রধানত এই বাগানের স্টাফ বা বাবুরাই করে থাকেন। আগে প্রতিমাসে বাবুদের বেতন থেকে চাঁদা বাবদ মাসিক কিছু টাকা ধার্য করা হত। শুরুর দিকে বেতনের প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসেবে চাঁদা ছিল। এমনকি 'মথুরা বাগান পোস্ট অফিস'-এ দুর্গাপুজোর নামে আলাদা পাসবুকও ছিল। পুজোকমিটির সেক্রেটারি সেই পাসবুকে প্রতিমাসে টাকা জমা করতেন। এছাড়া পুজোর আগে কোম্পানি থেকেও এককালীন অনুদান হিসেবে টাকা দেওয়া হত। বাগানের সাপ্লায়ার ও কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় করা হত। অবশ্য এখন নিয়ম বদলেছে। আজকাল পুজোর আগে এক্সিকিউটিভ ও স্টাফদের কাছ থেকে এককালীন চাঁদা নেওয়া হয়। কোম্পানিও আর্থিক সাহায্য করে। সাপ্লায়ার ও কন্ট্রাক্টরদের থেকেও কিছু চাঁদা তোলা হয়।

বছর দুয়েক হল বাগানের পুজো কমিটি গঠিত হচ্ছে মহিলাদের নিয়ে। এবছর সেক্রেটারি পদের ভার নিয়েছেন শ্রীমতি লক্ষ্মী কোণার ও শ্রীমতি তুলি বসু। বলাবাহুল্য মহিলাবর্গ পরিচালিত পুজোটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যতিক্রমী এবং সর্বতোভাবে সুসংহতপূর্ণ হয়ে থাকে। সঙ্গে থাকেন আরও মহিলাবৃন্দ। ঘরের কাজে সামাল দিয়েও পুজোর বাজার করা থেকে শুরু করে ভোগ রান্না, বিতরণ ও যাবতীয় দায়িত্ব সাধন করেন সকলে। পুজোর ক'টা দিন ফুরসত পাওয়া দুর্লভ। প্রসাদ বিতরণে কোনও ঘাটতি থাকে না। প্রত্যেকেই সে ব্যাপারে সচেতন থাকেন। তবে পুরুষ কর্মীরাও সর্বতোভাবে সাহায্য করেন যাতে কোনওরকম ত্রুটি বা বিঘ্ন না ঘটে। সেখানেই এই সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সার্থকতা।

বাগানের কলঘর অর্থাৎ ফ্যাক্টরির আওতার ভেতরেই পাকা মন্ডপ। সেখানেই প্রতিবছর পুজোর আয়োজন হয়। রঙিন ঝালরদার কাপড়, টুনি বাল্ব, আমপল্লব ইত্যাদিতে সেজে ওঠে পুজোর অঙ্গন। ষষ্ঠীর বোধন সন্ধ্যায় ঘট স্থাপন হয় প্রাচীন বেল গাছের সিমেন্ট বাঁধানো গোড়ায়। কর্মচারীরা সপরিবারে উপস্থিত থেকে মায়ের আবাহন করেন। মন্ডপে মায়ের মূর্তি নিয়ে আসা হয় পঞ্চমীতেই। শেষ তুলির টান ও গর্জন তেল বুলিয়ে মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় অস্ত্রশস্ত্র। বোধন শেষে একশো আট মোমবাতির আলোয় মন্ডপে অলৌকিক মায়াজাল তৈরি হয়। ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করেন বাগানের সুপারিনটেন্ডেট ম্যানেজার।

প্রতিবারের মতো এবারও পৌরোহিত্যের ভার মানিক চক্রবর্তীর ওপর। সময় নির্ঘন্ট হিসেবে পুজোর আয়োজনে যাতে অসুবিধে না হয়, তাই সপ্তমী থেকে নবমীর ঘট বিসর্জন অবধি তিনি মন্ডপ সংলগ্ন ঘরটিতেই থাকেন।

সপ্তমীর সকাল থেকে কলাবউকে স্নান করানোর তোড়জোড় শুরু হয়। তারপর লালপেড়ে শাড়িতে তিনি অধিষ্ঠিত হন। শুরু হয়ে যায় ঘটস্থাপন, আদি পুজোর উপাচার। অষ্টমীতে অঞ্জলির ভিড়। বেশ কয়েকবার অঞ্জলির ব্যবস্থা হয়। রান্না হলে ভোগ নিবেদিত হয় সযত্নে। ফলমূল, ফুল, ধূপধুনো, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি সব মিলেমিশে তখন সে এক পবিত্র পরিবেশ। রীতা চিকবড়াইক, গিরিজা বাসফোর, প্রতিমা ওঁরাও, ধুমা ওঁরাওদের হাতে ফুল-বেলপাতা তুলে দেন মিতা ভট্টচার্য, মুক্তি সাহা ও আরও অনেকে। অঞ্জলির মন্ত্র পড়েন পুজারি। নারী-পুরুষ, জাতি-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই 'শক্তিরূপেন' হয়ে ওঠেন। সেই শক্তিতেই চালিত হয় চা-বাগানে প্রতিদিনের বিরাটাকার কর্মযজ্ঞ।

অষ্টমীতে বাগানের সবাইকে দরাজ হাতে ভোগ খাওয়ানোর প্রচলন। প্রায় সাড়ে চার হাজার লোকের জন্য খিচুড়ি ভোগ ও লাবড়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে উপলক্ষ্যে বাগান থেকে ১৫০ কেজি চাল, ডাল ৬০ কেজি বরাদ্দ থাকে এবং সঙ্গে পরিমাণ মতো সবজি, মশলা ইত্যাদি, নুন, তেল কেনা হয়। সব মিলিয়ে ভারী সুস্বাদু সেই খিচুড়ি। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকেই এর স্বাদ নেন।

নবমীতে মন ভারী হয়ে আসে। পুজো, ভোগ নিবেদনের শেষে যজ্ঞ করেন পুরোহিত। তারপর দশমীতে মায়ের বিদায়ের বাঁশি বেজে ওঠে। আকাশ বাতাসও যেন কীভাবে টের পায়। চারিদিক ঢাকা পড়ে বিষণ্ণতার ধূসর আঁচলে। ঢাকের বাজনায় ঝরে বিসর্জনের আভাস।

মথুরা বাগানের পুজো কাহিনিতে লছমণ ওঁরাও এবং শঙ্কর ওঁরাও-এর অক্লান্ত অবদান থাকে প্রতিবারই। পুজোর প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিসের খবর ওঁদের নখদর্পনে এবং সতত দক্ষতায় মন্ডপে হাজির থেকে পুজোয় সাহায্য করে থাকেন। শঙ্করের শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও কর্মোদ্যমে ভাঁটা পড়ে না। মথুরা বাগানের পুজোতে এ-ও আরেক উপরি পাওনা।

'অষ্টমী নবমী গেলে দশমীর প্রহর এলে,
চোখের জলে ভাসিয়ে আমায় কৈলাশেতে যাস না ফিরে।
দেখব এবার কেমন করে চলে যাবি আমায় ছেড়ে,
দেব না দেব না যেতে বছর ভরে রাখব ধরে।'

তবু যেতে দিতে হয়। ঘনিয়ে আসে বিসর্জনের প্রহর। এঁয়োস্ত্রীরা মাকে সিঁদূরে সাজিয়ে দেন। মিষ্টিমুখ করিয়ে হাতে দেন পানের খিলি। সপরিবারে যাত্রা করেন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গতিনাশিনী মা। বিকেলের আলো লেগে থাকে মেঘের গায়ে। আবার শরৎ ঘুরে আসবে, দুলবে কাশের বনে সাদা ফুলের ঝাঁক। নীল আকাশে সারি বেঁধে উড়ে যাবে শ্বেতশুভ্র বকপাঁতি। জলদ ঘাগরায় সেজে মেঘ এক— মায়াবিনীরা ভেসে বেড়াবে। কখনও বা দু'পশলা বৃষ্টি ঢেলে দেবে ঝারি দিয়ে। পরক্ষণেই ঝলমলে রোদ।

বিসর্জন শেষ হতে সন্ধে নামে। জল থেকে কাঠামোর পাটাতন খুলে আনা হয় পরের বছর ঠাকুর তৈরির জন্য। বিদায় ব্যথায় আকাশে সজল ছলছল মেঘের জমায়েত। মাদলের তালে ঝুমুর নাচ জমে ওঠে। দশমীর একফালি চাঁদের রুপোলি মায়া বানিয়া নদীর তিরতিরে স্রোতে ভাসতে থাকে কৈলাশযাত্রায় মায়ের সঙ্গী হতে। করজোড়ে পারে দাঁড়িয়ে থাকে জাতি-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে অসংখ্য লোক।

মনে ভাবি মাগো আবার এসো। ততদিন মৃন্ময়ী মা তুমি চিন্ময়ী চিত্ত বাসিনী হয়ে থেকো। দেখো যেন সময়ের চোরা স্রোতে কেউ বেপথু না হয়। জলের দিকে তাকিয়ে দেখি আবছা জ্যোৎস্নায় মায়ের হাতে বরাভয় মুদ্রা। ভরসা ভরা ত্রিনয়ন।

ঢাকের বোলের সাথে আমিও গলা মেলাই 'আসছে বছর আবার হবে'।

মধুমিতা ভট্টাচার্য

এবারও চমক থাকছে কোচবিহারের পুজোয়

কোচবিহার শহর

যুব সংঘ

কোচবিহার শহরের উল্লেখযোগ্য পুজোগুলির মধ্যে এবারে রয়েছে চালতলা যুব সংঘের পুজো। এক বছর ধরে হয়েছে তাদের পুজো প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে বস্ত্রদান, চিকিৎসা শিবিরসহ একাধিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে তাদের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মহালয়ার প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে সূচনা হবে মূলপর্বের কর্মসূচি। মেদিনীপুরের শিল্পীরা বাঁশ, শোলা, পাটি দিয়ে তৈরি করছেন কাল্পনিক মণ্ডপসজ্জা। বহিরঙ্গে থাকছে দশ অবতারের সজ্জা। চন্দননগরের আধুনিকতম আলোকসজ্জাই নাকি এবারের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে বড় চমক যুব সংঘের। শারদ উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্যতম অঙ্গ।

সুভাষ ক্লাব

কোচবিহার ম্যাগাজিন রোড এক্সটেনশনের সুভাষ ক্লাব তাদের হীরকজয়ন্তী বর্ষ পালন করছে এবার। চন্দননগরের আলোয় ঝলমল করবে এলাকা। আলোকদৃশ্যে ফুটে উঠবে ডুয়ার্সের বন্য প্রাণ ও প্রকৃতি। এ ছাড়াও মূর্তি নির্মাণে রয়েছে চমক। সাবেকি মূর্তি হলেও প্রতিমায় মহিষের শিংকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। দু'টি পাহাড়ের মাঝে গুহা নির্মাণ করে হবে মণ্ডপসজ্জা। রাখিবন্ধনের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা হয়ে গেলেও মূলপর্বের উদ্‌বোধন হবে পঞ্চমীর সন্ধ্যায়।

খাগড়াবাড়ি সর্বজনীন

৬০ বছরের এই দুর্গোৎসব এবার পরিচালিত হচ্ছে তিনটি ক্লাবের সমন্বয়ে। এক পুজো ভেঙে যখন একাধিক পুজো সৃষ্টি হবার রেওয়াজে অভ্যস্ত সাধারণ মানুষ, তখন ব্যতিক্রমী চিন্তা নিয়ে খাগড়াবাড়ি এলাকার দেশবন্ধু ক্লাব, চৌরঙ্গি ইউনিট ও খাগড়াবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাব মিলেমিশে পুজোর আয়োজন করেছে। নিঃসন্দেহে এ পুজোয় এবার চমক রয়েছে। এখানে হোগলাপাতা দিয়ে নির্মাণ হবে মুম্বইয়ের তাজ হোটেল। চন্দননগরের আলোয় ফুটে উঠবে অলিম্পিকের ছবি। শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকবে কার্টুন। এককভাবে এই পুজো এতদিন দেশবন্ধু ক্লাব পরিচালনা করে এলেও বিগ বাজেটের এই পুজো পরিচালনায় এগিয়ে রয়েছে আরও দুটো ক্লাব। আকারে, আয়তনে, আয়োজনে জেলার বড় পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এটি।

মাথাভাঙা

কোচবিহার জেলার নজরকাড়া পুজোগুলির মধ্যে মাথাভাঙার হসপিটালপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব অন্যতম। এবারের এই পুজোর বৈশিষ্ট্য, চন্দননগরের আলোয় রাতকে দিন করে তুলে ধরা হবে। ৪৫ বছরের এই পুজোয় তৈরি করা হবে চারটি আলোকস্তম্ভ। ফোয়ারা থাকবে পুজো অঙ্গনে। মণ্ডপসজ্জা হবে তাজমহলের আদলে। আগ্রার তাজমহল পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম। বাঁশ-কাঠ দিয়ে তৈরি করা হবে তাজমহলের আদল। নিপুণভাবে তাজমহল যাতে মাথাভাঙার মণ্ডপসজ্জায় ফুটে ওঠে, এর জন্য আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দর্শন করে এসেছেন স্থানীয় শিল্পীরা। তাঁরাই ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পকর্ম। প্রদর্শনী মণ্ডপের পাশাপাশি পুজোমণ্ডপ হবে পৃথকভাবে। উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁদের আয়োজন সফল হবে।

মেখলিগঞ্জ

মেখলিগঞ্জের পুজোগুলির মধ্যে মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো অন্যতম। পুরনো বাজার এলাকার এই পুজোর থিম 'শৈশব'। হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে ফিরে পাবার চেষ্টা থেকেই এ ধরনের উদ্যোগ। মানবজীবনের শৈশবকাল থাকে স্মৃতিমধুর। সেই দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলা হবে এই পুজো অঙ্গনে। জীবনের প্রান্তবেলায় শৈশবকে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। প্রতিমা নির্মাণেও থাকবে অভিনবত্ব। নানা কারুকার্যে শৈশবের দিনগুলো ফুটে উঠবে পুজোমণ্ডপে।

তুফানগঞ্জ

জেলার নজরকাড়া পুজোগুলির মধ্যে রয়েছে তুফানগঞ্জের জোড়াইমোড় সর্বজনীন পুজো। ৩৫ বছরের এই পুজোয় এবার মণ্ডপ হবে ৮৫ ফুট উঁচু। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিচিত্রে সাজিয়ে তোলা হবে মণ্ডপের অভ্যন্তর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিল্পীরা নির্মাণ করছেন মণ্ডপ। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে হবে মণ্ডপসজ্জা। বাঁশ, কাঠ, মাদুর, মটরদানা দিয়ে তৈরি হবে এই মণ্ডপ। থাকছে চন্দননগরের আলোর ঝলকানি। দেবীমূর্তি নির্মাণেও থাকবে চমক। সমুদ্রমন্থনে দেবী দুর্গা— এই দৃশ্য ফুটবে এখানে। তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত জোড়াইমোড় পুজো কমিটির আশা, দর্শনার্থীদের ঢল নামবে তাঁদের শারদ উৎসবে। তুফানগঞ্জ শহরের উত্তরপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব পরিচালনা করে রকি ক্লাব। ৫৬তম এই পুজোর থিম এবার 'বিশ্ব বাংলা'। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হবে এই পুজো অঙ্গনে। প্লাই ও থার্মোকল দিয়ে হবে নানা কারুকার্য। থাকবে সচেতনতামূলক প্রদর্শনী। বিশ্ব বাংলার রূপ তুলে ধরতে রকমারি আলোর ব্যবহার থাকবে। প্রতিমা নির্মাণেও থাকবে বিশেষত্ব, সাবেকি ঢঙের পাশাপাশি অভিনবত্বের ছোঁয়া।

দিনহাটা

কোচবিহার জেলার বিগ বাজেটের পুজো এখন দিনহাটায়। জেলা শহরকে টেক্কা দিয়ে জমজমাট পুজোর আসর দিনহাটায়। এবার তিন-তিনটি পুজো কমিটি একত্রে ১ নং ওয়ার্ড সর্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে দিনহাটা কলেজের মাঠে। ১৬,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে হবে উৎসব অঙ্গন। ১ কিলোমিটার জুড়ে হবে আলোকসজ্জা। চন্দননগরের আলোকমালায় ফুটে উঠবে কোচবিহারের রাজকাহিনি। আমরা সবাই, হরিসভা ইউনিট, কলেজপাড়া বড় নাচিনা কমিটি— এই তিন আয়োজক সংস্থাকে এক সূত্রে গেঁথে একটি পুজোর আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছেন দিনহাটা ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়দীপ ঘোষ। এই পুজোর এবারের থিম 'ঐতিহ্যের কোচবিহার'। 'আমার কোচবিহার' নামাঙ্কিত মণ্ডপসজ্জায় থাকছে কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালিত মন্দিরগুলো। থাকছে রাসমেলার আদল, দেবী বাড়ি, মদন বাড়ি, বাণেশ্বর মন্দির, দিনহাটা মদন বাড়ি-সহ রাজপ্রাসাদ 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড'-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। ঐতিহ্যের কোচবিহারের অন্যতম দোতলা বাস থাকবে এই পুজো অঙ্গনে। থাকবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বিবর্তনের ইতিহাস। রাজা, রাজকাহিনি বাদেও তৈরি হবে মিউজিয়াম, হারিয়ে যাওয়া শিল্পকর্ম স্থান পাবে এখানে। এ ছাড়াও জীবন্ত মূর্তির মধ্যে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ' ও নির্মল কোচবিহার গড়ার আহ্বান থাকবে। উৎসব অঙ্গনে থাকবে দাঁড়িয়াবাধা, গোল্লাছুট, হাডুডুসহ একাধিক খেলা। আব্বাসউদ্দিন, নায়েব আলি, গঙ্গাচরণ বিশ্বাস মঞ্চে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-7 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

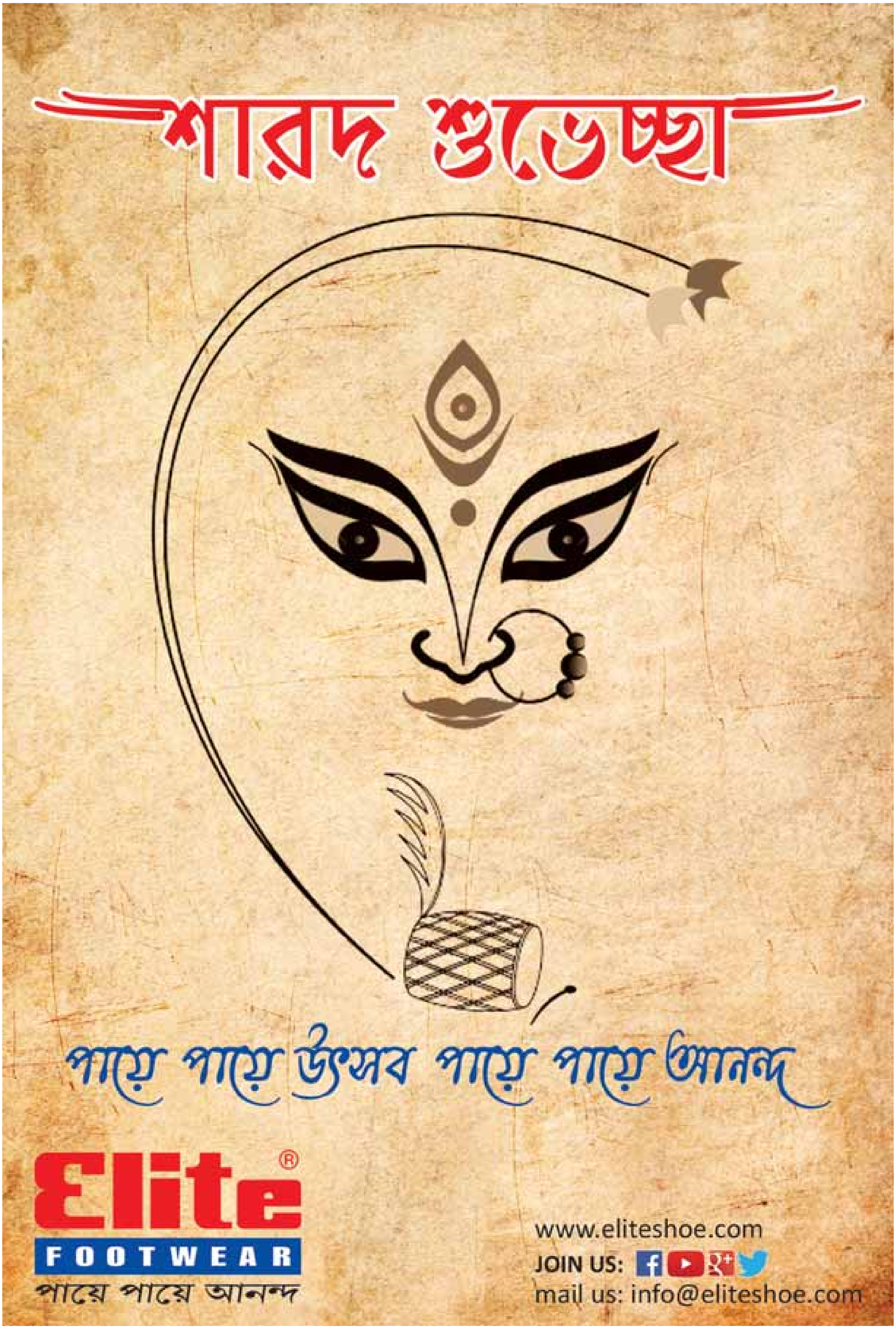

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.